বঙ্গ কমলবার্তা

সূচনা সংখ্যা। জুলাই ২০২৩। মূল্য ২০ টাকা

BJP

চোরমুক্ত

পঞ্চায়েত বিজেপির অঙ্গীকার

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৯ বছরেই নতুন ভারত

অপরাজেয় বিদেশনীতি

সংসদে সেঙ্গল

পঞ্চায়েতে হরির লুঠ

'মমতা' হীন গণতন্ত্র

স্কুলশিক্ষায় দুর্নীতির নবজোয়ার

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ

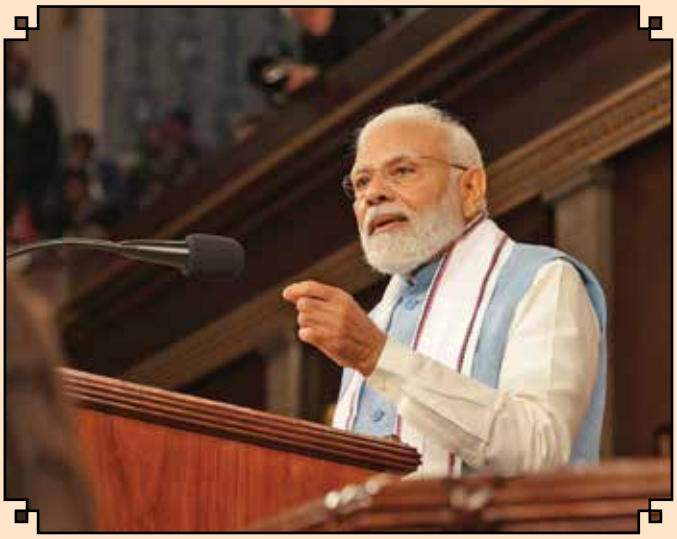

মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানানোর মুহূর্তে

মিশরের রাজধানী কায়রো-তে ঐতিহাসিক আল-হাকিম মসজিদ পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মিশরের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অফ দ্য নাইল'-এ ভূষিত করছেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফতে আল-সিসি

বঙ্গ
কমলবার্তা
সূচনা সংখ্যা। জুলাই ২০২৩।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৯ বছরেই নতুন ভারত ৪
জয়ন্ত গুহ

বসুধৈব কুটুম্বকম থেকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সব ক্ষেত্রেই অপরাজেয় মোদীর বিদেশনীতি ৬
প্রণয় রায়

মোদী সরকারের ৯ বছরে লক্ষ্যণীয় 'লক্ষ্মী' অর্থনীতি ৮
উজ্জ্বল সান্যাল

সংসদে সেঙ্গল: ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন ১০
বিনয়ভূষণ দাশ

সাক্ষাৎকার: অমিতাভ চক্রবর্তী ১২

সাক্ষাৎকার: সুকান্ত মজুমদার ১৩

স্কুলশিক্ষা— দুর্নীতি বেনিয়ম আর স্বজনপোষণের নবজোয়ার ১৪
অভিরূপ ঘোষ

ছবিতে খবর ১৭

ধুঁকছে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি: পঞ্চায়েতে হরির লুঠ ২২
অশোক কুমার লাহিড়ি

ভোট-ভূতদের দাপাদাপি! নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করুন ২৪
সৌভিক দত্ত

'মমতা' হীন গণতন্ত্র ২৬
কৌশিক কর্মকার

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৮
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

অখণ্ড ভারত এবং জম্বুদ্বীপ ২০৫০ ও ২০৭০ ৩১
অনিকেত মহাপাত্র

ফেক নিউজ ৩২

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক: জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, উজ্জ্বল সান্যাল, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় বর্মা

সম্পাদকীয়

আবারও ফিরে এল 'কমলবার্তা'। নতুন রূপে, নতুন কলেবরে সূচনা হল বঙ্গ বিজেপির মুখপত্র 'বঙ্গ কমলবার্তা'র। শুভ সূচনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার সাধারণ মানুষকে আমাদের শ্রদ্ধাবনত প্রণাম। আপনাদের আশীর্বাদ ও ভালবাসা আগামীদিনে আমাদের শক্তি যোগাবে।

দেশের সাধারণ মানুষের এই অসীম শক্তি গত ৯ বছরে 'হার্ভার্ড ফেরত' পণ্ডিতদের হিসাবের খাতা গোলমাল করে দিয়েছে। তাঁদের 'অমায়িক গালাগালি' নস্যাৎ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৯ বছরেই বিশ্ব অর্থনীতিতে পঞ্চম স্থানে ভারতবর্ষ। উন্নয়নের চেষ্টা আগেও হয়েছে এদেশে। বিভিন্ন সরকারের আমলে। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই প্রথম নতুন ভারতের রাষ্ট্রনির্মাণে ভারতের বিপুল জনশক্তিকে নরেন্দ্র মোদী শরিক করলেন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সবার প্রয়াস ও বিশ্বাসে এক শক্তিশালী ভারতের ৯ বছরের এই বিকাশ যাত্রায় সাক্ষী থেকেছে সমগ্র বিশ্ব। বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্র-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের ভারত বাস্তবায়িত হয়েছে সবার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে, তিলেতিলে প্রতিদিন। জনসেবায় দেশের দুর্বল-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত ও মহিলাদের জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করে নতুন ভারতের জনবিকাশ।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের ৯ বছরে নতুন ভারতের বিপুল উন্নয়ন যজ্ঞে দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্য সুবিধা ভোগ করলেও পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের দুর্নীতি, পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি, দূরদর্শিতার অভাব এবং নিরলস 'অনুপ্রেরণা'-র নিরন্তর খামখেয়ালিপনায় বঞ্চিত হয়েছে এই রাজ্যের কৃষক, গ্রাম-শহরের গরীব মধ্যবিত্ত মানুষ এবং জনজাতি বিকাশ। এরাজ্যে হযবরল 'অনুপ্রেরণা'-র রোষানলে প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে প্রকল্প থেকে উপকৃত হচ্ছে দেশের কোটি কোটি মানুষ। এরাজ্যে ভোট এবং দুর্গত মানুষের জন্য পাঠানো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের চাল— দুটোই চুরি হয়। আসাম-ওড়িশায় পরিকাঠামো বিকাশে যখন জোয়ার এসেছে, আমাদের রাজ্যে তখন 'অনুপ্রেরণা'-য় চপশিল্প এবং ছাগলে খায় ২২ লক্ষ টাকার গাছ। এই অদ্ভুত 'তাসের দেশ'-এ 'রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন'। অর্থনীতি বলতে চিটফান্ড, লটারি, মদশিল্প, গরু ও কয়লা চুরির টাকা। এরাজ্যের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-মহার্ঘ ভাতা-আশা-আকাঙ্খা-ভবিষ্যৎ সব চুরি হয়ে গেছে। পঞ্চায়েত বা পুরসভার স্বায়ত্তশাসন এখানে স্বপ্নের মতো। সবাই এখন 'অনুপ্রেরণা'-র এজেন্ট। এমন একটা কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে 'হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট শাসিত' রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মানে 'বঙ্গ কমলবার্তা'র ভূমিকা হবে মহাভারতের সঞ্জয়ের মতো। যা দেখব তাই বলব। সত্যমেব জয়তে। জয় হিন্দ। বন্দেমাতরম।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৯ বছরেই নতুন ভারত

জয়ন্ত গুহ

১৯৪৭ থেকে ২০১৩ সাল। কেউ কথা রাখেনি। কেউ বা চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষমেশ ভারতবর্ষ সেই তিমির-অবগুণ্ঠনে। কী এমন হল ২০১৪ সালে যে নরেন্দ্র মোদী আসতেই তরতর করে ঘুরতে শুরু করল অর্থনৈতিক বিকাশের চাকা? অটল বিহারী বাজপেয়ীর আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে ৯ বছরেই নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রনির্মাণে যা করেছেন, হার্ভার্ড ফেরত পণ্ডিতরা ৬৬ বছরেও তা বুঝতে পারেননি! নাকি বুঝতে চাননি!

তাঁর শাসনকালে মাত্র ৮ বছরেই, ২০২২ সালে বিশ্বের অর্থনীতিতে পঞ্চম স্থানে ভারতবর্ষ। তাঁর শাসনকালের ৬ বছরে, ২০২০ সালে দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোভিড-১৯ ভাইরাসের আক্রমণ। মুখ থুবড়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল ভারতের অর্থনীতির। হয়নি। বরং তাঁর শাসনকালের ৭ বছরে, ২০২১ সালে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি। ওই একই সময়ে, দ্রুততার সঙ্গে দেশ জুড়ে টীকাকরণ ও দেশীয় টীকা প্রস্তুতিতে, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে তাঁর আত্মনির্ভর ভারত। প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছিলেন, 'ভারতের ভ্যাকসিন বিশ্বের সম্পদ'। তাঁর শাসনকালের ৫ বছরে, ২০১৯ সালে ভারতে মুসলমান মহিলাদের নিরাপত্তা ও সম্মান দিতে তিন তালাক প্রথার অবসান এবং জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করে আতঙ্কমুক্ত উপত্যকায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় স্বাধীন ভারতের আত্মবিশ্বাস। তাঁর শাসনকালের ৪ বছরে, ২০১৮ সালে দেশ পেয়েছে আয়ুষ্মান ভারত। দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের কাছে যা ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর শাসনকালের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছর, ২০১৬-২০১৭তেই ভারতবর্ষের বহু প্রতীক্ষিত অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ২০১৬র নভেম্বরে নোটবন্দী। ২০১৭ সালের জুলাইয়ে জিএসটি বা 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ট্যাক্স' ভাবনার বাস্তবায়ন। স্বাধীনতার পর যা ছিল দেশের সবচেয়ে বড় কর সংস্কার। তিনি যা করেছেন, স্বাধীন ভারতে ২০১৪র আগেই করা যেত, কিন্তু নতুন ভারত নির্মাণের জন্য এবং জগতসভায় ভারতবর্ষকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বাধীনতার পর ৬৬ বছর দেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁর জন্য— তিনি নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশকে বুঝতে বিদেশে পড়তে যাননি। কিন্তু আসমুদ্র-হিমাচল দেশের মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পড়তে পেরেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার নির্মাণ ঠাণ্ডা ঘরে বসে বিদেশ থেকে আমদানি করা তত্ত্বে তৈরি হয়নি। দেশমাতৃকার আশীর্বাদ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভিড়ে, ধুলোমাটি গায়ে মেখে শুরু হয়েছিল তাঁর নতুন ভারত নির্মাণের স্বপ্ন। তাঁর চোখ দিয়েই গোটা বিশ্ব দেখেছে-বুঝেছে- চিনেছে —নতুন ভারতবর্ষকে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পর তিনিই প্রথম দেশনেতা, যিনি 'সমগ্র পৃথিবীই আমার পরিবার', এই ভারতীয় ভাবনায় ভাবাতে পেরেছেন গোটা বিশ্বকে।

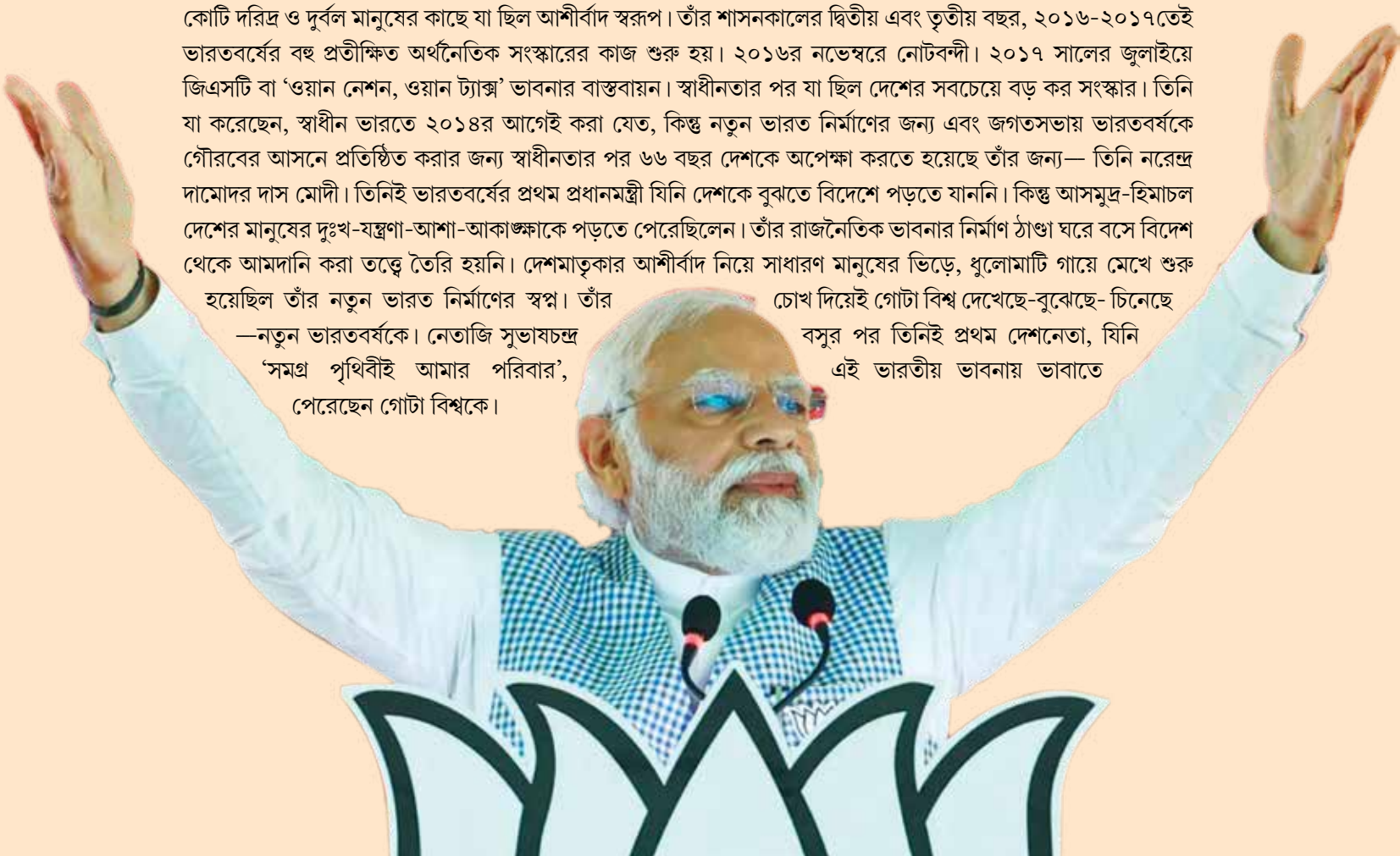

অর্থনৈতিক সংস্কার

আমেরিকান বিনিয়োগকারী সংস্থা এবং অর্থনৈতিক পূর্ভাবাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমীহ করার মতো নাম, মর্গান স্ট্যানলি। তাঁদের ২০২২-এর রিপোর্টে, ভারতের অর্থনীতি নিয়ে তাঁরা বলেছিল, '২০২৭-এর মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে ভারত।' কিন্তু কোন পথে ভারতীয় অর্থনীতির এমন উত্থান? 'হার্ভার্ড শিক্ষিত' পণ্ডিতরা যা বুঝতে পারেনি, নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকার বুঝতে পেরেছিলেন অনেক আগেই। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, নরেন্দ্র মোদীর সুদূরপ্রসারী নীতি 'পণ্য এবং পরিষেবা কর বা জিএসটি-র মতো সংস্কার ভারতীয় অর্থনীতির গতি দ্রুত করেছে। কর্পোরেট কর ছাড়ে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সরকারের উৎপাদন সম্পর্কিত আর্থিক সহায়তার প্রকল্পগুলিও অর্থনীতিকে মজবুত করেছে।... আর এই সমস্ত কারণেই দ্রুত এগোচ্ছে দেশের অর্থনীতি।' ২০২৩-এ মর্গান স্ট্যানলি-র রিপোর্ট আরও চমকপ্রদ কিন্তু তার আগে সহজ কথায় বুঝে নেওয়া যাক, মোদী সরকারের ৯ বছরে নতুন ভারত কীভাবে উন্নয়নকে দেখেছে এবং ধাপে ধাপে পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যদিও 'উন্নয়ন' শব্দটির বদলে আমরা 'বিকাশ' (নরেন্দ্র মোদীর ভাষায়) শব্দটিকে ব্যবহার করব। সবার প্রয়াসে এবং সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যে উন্নয়ন, সেটাই প্রকৃত উন্নয়ন বা বিকাশ। ইংরাজিতে Growth.

সবার সঙ্গে সবার প্রয়াসে সবার বিকাশ

৯ বছরে নতুন ভারতের নির্মাণে ভারত রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র বা দর্শন ছিল 'Inclusive Growth', মানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির বিকাশে দেশের সব মানুষকে শরিক করা; যাতে বিকাশের সুফল দেশের হতদরিদ্র মানুষটির কাছেও পৌঁছে যায়। আজকের দিনে শুধু GDP বাড়লেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন হয়না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, যুবসমাজের দক্ষতার বিকাশ এবং কর্মসংস্থানকে মাথায় রেখে এগিয়েছে নতুন ভারতের জয়ধ্বজা। আর সেই যাত্রায় নরেন্দ্র মোদীর মাস্টারস্ট্রোক ছিল, দেশের অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে মহিলাদেরও সামিল করা। এক বিরাট 'নারীশক্তি' দেশে ছিল বহুকাল ধরে। মোদী সরকারের নতুন ভারতে প্রথম তার বিকাশ হল, যখন 'মহিলাদের উন্নয়ন থেকে মহিলাদের নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন'-এর নীতিকে সামনে নিয়ে এলেন নরেন্দ্র মোদী।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ২০১৬ সালে চালু হয়েছিল উজ্জ্বলা যোজনা। বিনামূল্যে লক্ষ লক্ষ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার। জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক সম্মান (বিশেষভাবে

মহিলাদের সামাজিক সম্মান)-এর কথা মাথায় রেখে ২০১৪ সালে স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীন গ্রাম ভারতে শৌচালয় নির্মাণ কর্মসূচী। গরীব মানুষের কাছে সাধ্যের মধ্যে উচ্চমানের ওষুধ পৌঁছে দিতে 'প্রধানমন্ত্রী জন ওষধি যোজনা'। ২০১৮ সালে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, যাতে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষজনরা বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা কভারেজ পাবে। সামাজিক সুরক্ষায় এইসব ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচী একটি উদাহরণ মাত্র। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য সরকারী সুবিধা ও স্কিম। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবাতেই আছে ৭৪টি প্রকল্প।

ডিজিটাল ভারতে গরীবকল্যাণ

২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেই সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদীর সরকার শুরু করেছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর। ২০১৪ সালের ১৫ অগাস্ট লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন জনধন যোজনা। এই যোজনার হাত ধরে নতুন ভারতের অর্থনীতিতে শুরু হল ডিজিটাল প্রযুক্তির। জনধন-আধার-মোবাইলের সম্মিলনে আমূল বদলে গেল সরকারি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন। দেশের কল্যাণমূলক কাজে তৈরি হল একটা দুর্নীতিমুক্ত সিস্টেম। সহজ সরল হয়ে গেল, গরীব মানুষের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার সুযোগ। ২০১৮তেই দেশে ৮০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হয়ে যায়। ২০১৪-য় যা ছিল ৫৩ শতাংশ। এরপর একে একে এল উল্লেখযোগ্য সব মানবকল্যাণ যোজনা। কৃষক কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, সকলের জন্য আবাস এবং মুদ্রা যোজনায় ঋণ বা সরাসরি সরকারি সাহায্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়েছে দেশের কোটি কোটি মানুষ।

শিবজ্ঞানে জীবসেবা

বিপুল জনসমর্থন নিয়ে প্রথমবার ক্ষমতায় এসে নরেন্দ্র মোদী প্রথম যেটা করেছিলেন সেটা ছিল দৃষ্টিভঙ্গী এবং অভ্যাসের সংস্কার। ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে যা ছিল অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রথম ধাপ। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি এবং গান্ধীজি, জাতির উন্নয়নে সুস্থ-নীরোগ-কুসংস্কার

মুক্ত যে সমাজের জন্য সারাজীবন লড়াই চালিয়েছিলেন— সেই কাজটাই 'দেশের সেবক' নরেন্দ্র মোদী শুরু করেছিলেন স্বচ্ছ ভারত নির্মাণের অধীন গ্রাম ভারতবর্ষে দরিদ্র নারায়ণের জন্য শৌচালয় নির্মাণ, ঘরে ঘরে শুদ্ধ পানীয় জল ও বিদ্যুৎ, কৃষকের জন্য সুলভ বিদ্যুৎ এবং সেচের জল। যদিও একই সময়ে তিনি বারবার গ্রাম ভারতবর্ষকে বলেছেন, প্রকৃতির যত্ন নাও, প্রকৃতিও তোমার যত্ন নেবে। অর্থাৎ দেশের জনগণের পাশাপাশি প্রকৃতিকেও তিনি দেশের বিকাশে সামিল করেছিলেন। গুরুত্ব দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের চিরন্তন দর্শনকে। নতুন ভারত নির্মাণে তাঁর কর্মধারায় কখনও প্রতিফলিত হয়েছে গান্ধীজির শেষ ইচ্ছাপত্র 'লোকসেবা সঙ্ঘ'-এর সেবকের ভূমিকা। আবার কখনও প্রবলভাবে প্রতিফলিত স্বামী বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র মহামন্ত্র। ততদিনে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে অন্যতম বিশ্ব নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ২০১৯এর আগেই ভারত বিশ্বের সম্ভাবনাময় সুপারপাওয়ার এবং এশিয়ায় সমীহ জাগানো সামরিক শক্তি। এবার সর্বশক্তি নিয়োগের মাহেন্দ্রক্ষণ পরিকাঠামো বিকাশে।

আত্মনির্ভর ভারতে পরিকাঠামো বিকাশ

সেঙ্গল বা ধর্ম দণ্ড নিয়ে নরেন্দ্র মোদী যখন ভারতের নতুন পার্লামেন্টে ঢুকছেন তখন যেন 'নতুন ভারত' ধীর, বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর পদক্ষেপে ক্রমশ এগিয়ে

বাকি অংশ ২৭ পাতায়

বসুধৈব কুটুম্বকম থেকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ

সব ক্ষেত্রেই অপরাজেয় মোদীর বিদেশনীতি

প্রণয় রায়

জি২০ থেকে জি৭— সবেতেই ভারতের কর্তৃত্ব। দক্ষিণ এশিয়ার 'পাওয়ার প্লে'-তে ভারতের দাপট। লাল চীনের একতরফা দাদাগিরি এখন গল্পকথা। ধুঁকছে পাকিস্তান। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা অনেকাংশেই নির্ভরশীল ভারতের ওপর। আমেরিকার সঙ্গে ক্রমশ নিকটে যাওয়া ভারতকে উপেক্ষা করা এখন কঠিন। কূটনীতিতে ভারত এখন 'দ্য বস'।

২০১৪ সালের ২৬ মে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন মাহেন্দ্রক্ষণ। শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে বিপুল জনমত নিয়ে কেন্দ্রে গঠিত হল বিজেপি সরকার। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। দেশের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো থেকে প্রতিরক্ষা, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, বৈদেশিক নীতি থেকে করোনার মত কঠিন বিপর্যয় সামলে ৯ বছরে পদার্পণ করা মোদী সরকার সকল ক্ষেত্রেই দশে দশ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সুচারু বৈদেশিক নীতির কারণে আজ সমগ্র দেশ কুর্ণিশ জানাচ্ছে ভারতবর্ষকে। জি-২০ বৈঠক থেকে সম্প্রতি জি-৭ বৈঠক সবেতেই স্বকীয়তার পরিচয় রেখে ৯ বছর সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছে বিজেপি সরকার। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা, বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করার বিষয়ে জোর দেন মোদী। সরকারের ১০০ দিন সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তিনি নেপাল, ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশে সফর করেন। বিগত ৯ বছরে ভারতবর্ষ সমর্থ হয়েছে প্রায় সব দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক নীতি এক সদর্থক জায়গায় রয়েছে এবং তা সারা বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিয়েছে।

সম্প্রতি বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য ভারতবর্ষকে আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের অন্যতম নেতৃত্বপ্রদানকারী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি এও জানিয়েছেন ভারতবর্ষ কীভাবে এই ৯ বছরে সেইসকল দেশগুলির গুরুত্ব পেয়েছে যারা আগে উপেক্ষা করত। ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের চাপে মাথা নীচু করে নয়, বরং শত্রু দেশের চোখে চোখ রেখে জবাব দিচ্ছে আমাদের দেশ। বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও 'নতুন ভারত'কে চিনতে শুরু করেছে। একটা সময় ছিল যখন পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গী হানার কয়েকমাস পর ভারতবর্ষ ইসলামাবাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসত। আর আজ দেখুন! জম্মু কাশ্মীর সহ ভারতের যে কোনও অংশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হলে ভারতের পাল্টা প্রতিরোধের ভয়ে থরহরি থাকে পাকিস্তান।

জি-৭ বৈঠকে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের উদ্দেশে স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছেন সন্ত্রাস ও শান্তি আলোচনা সমান্তরাল ভাবে চলতে পারে না। পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক পড়শিসুলভ সম্পর্কই চায় ভারত। কিন্তু সে জন্য সন্ত্রাস এবং শত্রুতামুক্ত অনুকূল পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব পাকিস্তানের। ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং ২০১৯ সালের বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকও

বাহুবলি ভারতের নিদর্শন। ২০১৬ সালে পাঠানকোট হামলার পরে ভারতবর্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনার পথে আমরা হাঁটব না।

শুধু কি পাকিস্তান? চীন কোনওদিন ভেবেছিল চীনা রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ভারত তার শক্তি প্রদর্শন করবে? ২০১৭ সালে ডোকালাম ও ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় ড্রাগনবাহিনীকে মোকাবিলা করে কমিউনিস্ট চীনকে ভারত সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আরও একটি বিষয় চীনকে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করছে সেটা হল ভারতের সঙ্গে আমেরিকার গভীর সখ্যতা। ২২ জুন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীই দ্বিতীয়বার আমেরিকার জয়েন্ট মিটিংয়ে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এর আগে ভারতের কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বই সম্ভবত এতটা গুরুত্ব পাননি। ভারতের জাতীয় স্বার্থ এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হল QUAD ফোরাম। শুধু চীনের আগ্রাসী মনোভাবকে দমন করাই নয়, ভারতের সামরিক, বাণিজ্যিক, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কোয়াড অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে বন্ধু রাষ্ট্র ও প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে আরও সুস্পষ্ট ভাবে চিনতে শিখেছি আমরা।

কোয়াডের পাশাপাশি চীনা ঋণের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে আর্থিকভাবে দুর্বল ছোট ছোট দেশগুলিকে সাহায্য করছে ভারত। জি-২০ বৈঠকে চীনকে ঋণের বোঝা কমানোর অনুরোধ করেছে ভারত। পাশাপাশি চৈনিক আগ্রাসন রুখতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পাপুয়া নিউ গিনি সফর অন্যতম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মোদীই ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি এই দ্বীপরাষ্ট্র সফর করলেন এবং যেভাবে পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপে মোদীর পা ছুঁয়ে সম্মান জানালেন এবং মোদীও তাঁকে বুকে টেনে নিলেন তা থেকে বলাই যায় খুব শীঘ্রই এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হতে চলেছে দুই দেশের মধ্যে। পাশাপাশি মোদীর অস্ট্রেলিয়া সফরেও দুই দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেস। ওই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তাঁর 'বন্ধু' মোদীকে 'দ্য বস' বলে সম্বোধন করেন অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মোদীজির আমলে বিদেশনীতির আরও একটি ভিত্তি হল 'Act East', 'Think West' and 'Connect Central Asia'- নীতির মাধ্যমে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে শান্তির পরিবেশ তৈরি করা, পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, বাণিজ্যিক, সামরিক সহ একাধিক বিষয় নিয়ে কাজ চলছে। Solar Alliance (ISA), Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), Lifestyle for Environment (LiFE), এবং International Big Cat Alliance (IBCA) সহ একাধিক নীতির মাধ্যমে নানা দেশের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে।

ভারতে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষক বৈঠক ভারতের বিদেশনীতির সাফল্যে অন্যতম একটি পালক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১০০টিরও বেশি জি-২০ বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। এপ্রিল পর্যন্ত বিশ্বের ১১০টি দেশের ১২ হাজার ৩০০ প্রতিনিধি এসেছেন এই উপলক্ষে। সমগ্র বিশ্বে নানা সময়ে ত্রাতার ভূমিকায় দেখা গেছে ভারতবর্ষকে। কোভিডের সময় ১০০র অধিক দেশে ভ্যাকসিন সরবরাহ করা, ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্কে অপারেশন দোস্তের মাধ্যমে ৫,৯৪৫ টন ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো, মালদ্বীপ, ভুটান, আফগানিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, মরিশাস, শ্রীলংকা, মায়ানমার সহ একাধিক দেশকে অর্থ সাহায্য প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরুর দাবিদার বানিয়েছে। ২০২৩ সাধারণ বাজেটে ২৪০০ কোটি টাকা ভুটান, ৪০০ কোটি টাকা মালদ্বীপ, ২০০ কোটি টাকা আফগানিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

আজ ভারত এমন এক পাওয়ার সেন্টারে রয়েছে যেখানে আর কারও সাহস হবে না ভারতকে উপেক্ষা করার। মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সগর্বে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে— তাকে ছাড়া সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়।

মোদী সরকারের ৯ বছরে
লক্ষ্যণীয় 'লক্ষ্মী' অর্থনীতি

উজ্জ্বল সান্যাল

একদিকে যখন মাননীয়ার খামখেয়ালিপনায় তলানিতে ঠেকেছে রাজ্যের অর্থনীতি এবং মানসম্মান, অন্যদিকে তখন ৯ বছরে গোটা বিশ্বের কাছে সম্মানীয় হয়ে উঠেছে নরেন্দ্র মোদীর ভারতবর্ষ। পটনায় জড়ো হওয়া 'মহাঘোট' যখন দেশ নিয়ে গেল গেল রব তুলছে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের অপার উত্থানকে। রাজ্যের মুখ থুবড়ে পড়া অর্থনীতির আসল চেহারাটা ঢাকতে এবং ভোটারদের মন ভোলাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুড়িমুড়কির মত ঘোষণা করেছেন 'শ্রী' সিরিজের অগুন্তি প্রকল্প। অন্যদিকে দেশের লক্ষ্মীশ্রী ফেরাতে নরেন্দ্র মোদী গত ৯ বছরে গোটা দেশকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছেন আত্মনির্ভর অর্থনীতির লক্ষ্যে।

অর্থনীতির পুরনো স্কুলের মতে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি, শ্রম এবং মূলধন তিনটি প্রধান উপাদান। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা প্রযুক্তিকে যোগ করল উৎপাদনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে। জমি, পুঁজি বা প্রযুক্তিকে প্রয়োজন অনুসারে কমবেশি ঠিকঠাক করে নেওয়া গেলেও অর্থনীতির বৃদ্ধি এবং বিকাশে আধিপত্য বিস্তার করে শ্রমশক্তির গুণমান এবং পরিমাণ। এশিয়ার অনেক দেশের মতো ভারতেও রয়েছে তরুণ জনসংখ্যা। বর্তমানে নীতিনির্ধারকরা যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে নজর দিয়েছেন তাতে ভবিষ্যত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য এই তরুণ প্রজন্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বব্যাংকের মতে, ২০২০-২০৫০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার কর্ম-বয়স জনসংখ্যার সম্ভাব্য বৃদ্ধি প্রায় ২৫৪ মিলিয়ন যা বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির তুলনায় ৩০.৬%। এরমধ্যে শুধু ভারতেই বৃদ্ধি পাবে ১৬.৫%। এদিকে, চীনের কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যা একই সময়ের মধ্যে প্রায় ২২৬ মিলিয়ন হ্রাস পাবে এবং উন্নত বিশ্বেরও বেশিরভাগ অংশে হ্রাস পাবে। এটি মাথায় রেখে গত ৯ বছর ধরে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিয়েছে। যে প্রকল্পগুলি তরুণ প্রজন্মের জন্য তৈরি করেছে কর্মসংস্থান।

মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার তার প্রথম ৫ বছরের মেয়াদ শেষ করেছে এবং এখন তার দ্বিতীয় মেয়াদের কাজ চলছে। গত ৯ বছরে মোদী সরকার যে ১০টি প্রধান প্রকল্পে সাফল্য অর্জন করেছে—

১। মেক ইন ইন্ডিয়া

বিনিয়োগের সুবিধার্থে, গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) বৃদ্ধি করতে, পণ্যের

মৌলিকতা নিশ্চিত করতে এবং শিল্প খাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষতাভিত্তিক চাকরি তৈরি করতে নরেন্দ্র মোদী শুরু করেছিলেন একটি বড় জাতীয় কর্মসূচি। মোদী তাঁর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ধারণা নিয়ে বিশ্বের কাছে পৌঁছেছেন, যা কিনা বিদেশী কোম্পানিগুলির কাছে একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। ভবিষ্যৎ কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইন সংস্কার ভারতের উৎপাদন শিল্প এবং বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

২। স্বচ্ছ ভারত অভিযান

২০১৪-র ২ অক্টোবর মোদী সকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালু হয়েছিল। অনেকে এটিকে মোদীর একটি মাস্টারস্ট্রোক বলে অভিহিত করেছেন কারণ এই প্রকল্প তাঁকে জনসাধারণের উপলব্ধিতে মহাত্মা গান্ধীর সমতুল্য করেছে এবং মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি এবং নাগরিক বোধের উপর কাজ করার বার্তা দিয়েছে।

৩। জন ধন যোজনা

১৫ আগস্ট ২০১৪ সালে মোদী জন ধন যোজনা ঘোষণা করেছিলেন। অ্যাকাউন্টধারীদের ক্রেডিট সুবিধা, পেনশন এবং বীমা প্রদানের জন্য প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছানোর উপর এর মূল ফোকাস করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে, ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৪.২৩ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

৪। অর্থনৈতিক সংস্কার এবং নীতি নির্ধারণ

মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের প্রাথমিক ফোকাস হল উৎপাদন ও রপ্তানি খাতে বড় ধরনের সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা। সরকার শুধু রেলওয়ে, বীমা এবং প্রতিরক্ষায় এফডিআই-এর সীমা বাড়ায়নি বরং লোকসানে থাকা পাবলিক সেক্টর কোম্পানিগুলোর বেসরকারিকরণকেও উৎসাহিত করেছে।

৫। বিদেশনীতিতে অগ্রাধিকার

মোদীর বিদেশ নীতি বর্তমানে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বিশ্বজুড়ে ভারতে বিনিয়োগ করার অনুকুল পরিবেশ তৈরী করার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তিনি বেশ কয়েকজন সামনের সারিতে থাকা আমেরিকান ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানান।

৬। কাশ্মীরে ভারত রাষ্ট্রের আত্মবিশ্বাস

কাশ্মীর ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু পূর্ববর্তী কেন্দ্র সরকার এবং স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে কাশ্মীর নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। মোদী সরকারের সময় বদলে গেছে চিত্র। বন্যা যখন উপত্যকায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, তখন মোদী সরকারের ভূমিকা ছিল প্রশংসা করার মতো। মোদী বন্যা কবলিত এলাকা এবং কাশ্মীরের জনগণের জন্য যেভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে তাঁর সরকার জিতে নিয়েছিল কাশ্মীরের মানুষের হৃদয়।

৭। মন কি বাত

মন কি বাত হল সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর আরেকটি বড় উদ্যোগ। এটি একটি রেডিও টক শো যেখানে প্রধানমন্ত্রী দেশের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কথা বলেন এবং সেই বিষয়ে তাঁর ধারণা শেয়ার করেন। এটি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত হয়।

সেখান থেকে এটি বিভিন্ন রেডিও ও টিভি চ্যানেলে প্রচারিত ও সম্প্রচার করা হয়। এর প্রথম পর্বটি ৮ অক্টোবর, ২০১৪ সালে সম্প্রচারিত হয়েছিল। আজ পর্যন্ত মোট ১০০টি পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে।

৮। আয়ুষ্মান ভারত

আয়ুষ্মান ভারত হল ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের চালু করা একটি স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে, প্রতি বছর সমস্ত সুবিধাভোগী পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য কভারেজ দেওয়া হবে। এই প্রকল্পটি ১০ কোটিরও বেশি দরিদ্র পরিবারকে কভার করবে।

৯। ডিজিটাল ইন্ডিয়া

ডিজিটাল ইন্ডিয়া ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর আরেকটি বড় উদ্যোগ যা ভারতের উন্নয়নে সাহায্য করেছিল। কম দামে আরও ডেটা পাওয়ার কারণে প্রতিদিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। ইউনাইটেড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই)ও এই উদ্যোগের একটি অংশ ছিল।

১০। আত্মনির্ভর ভারত— ভোকাল ফর লোকাল

স্থানীয় পণ্যের দেশজুড়ে প্রচারের প্রকৃষ্ট সময় হিসাবে কোভিড-১৯র সময়কালকে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তখনই তিনি 'আত্মনির্ভর' হওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং স্থানীয় পণ্যের জন্য ভোকাল বা সরব হওয়ার আহ্বান জানান। এটি স্থানীয় বিক্রেতাদের প্রচার করার লক্ষ্যে করা হয়েছিল যাতে তারা মহামারীজনিত কারণে অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করতে পারে।

মোদী সরকারের নেতৃত্বে ৯ বছরে দেশের বিকাশ শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্ব অর্থনীতিতে এখন যে কোনও আলোচনা ভারতকে বাদ রেখে অসম্ভব। উন্নত দেশগুলির 'গ্লোবাল নর্থ' গ্রুপ যদি আমারিকার নেতৃত্বে চলে তাহলে আগামীদিনে 'গ্লোবাল সাউথ' গ্রুপের নেতৃত্ব দিতে চলেছে নরেন্দ্র মোদীর ভারতবর্ষ। বলা যেতে পারে, আগামীদিনে উন্নয়নশীল দেশগুলির 'গ্লোবাল সাউথ' গ্রুপের রাজধানী হতে চলেছে ভারতবর্ষ।

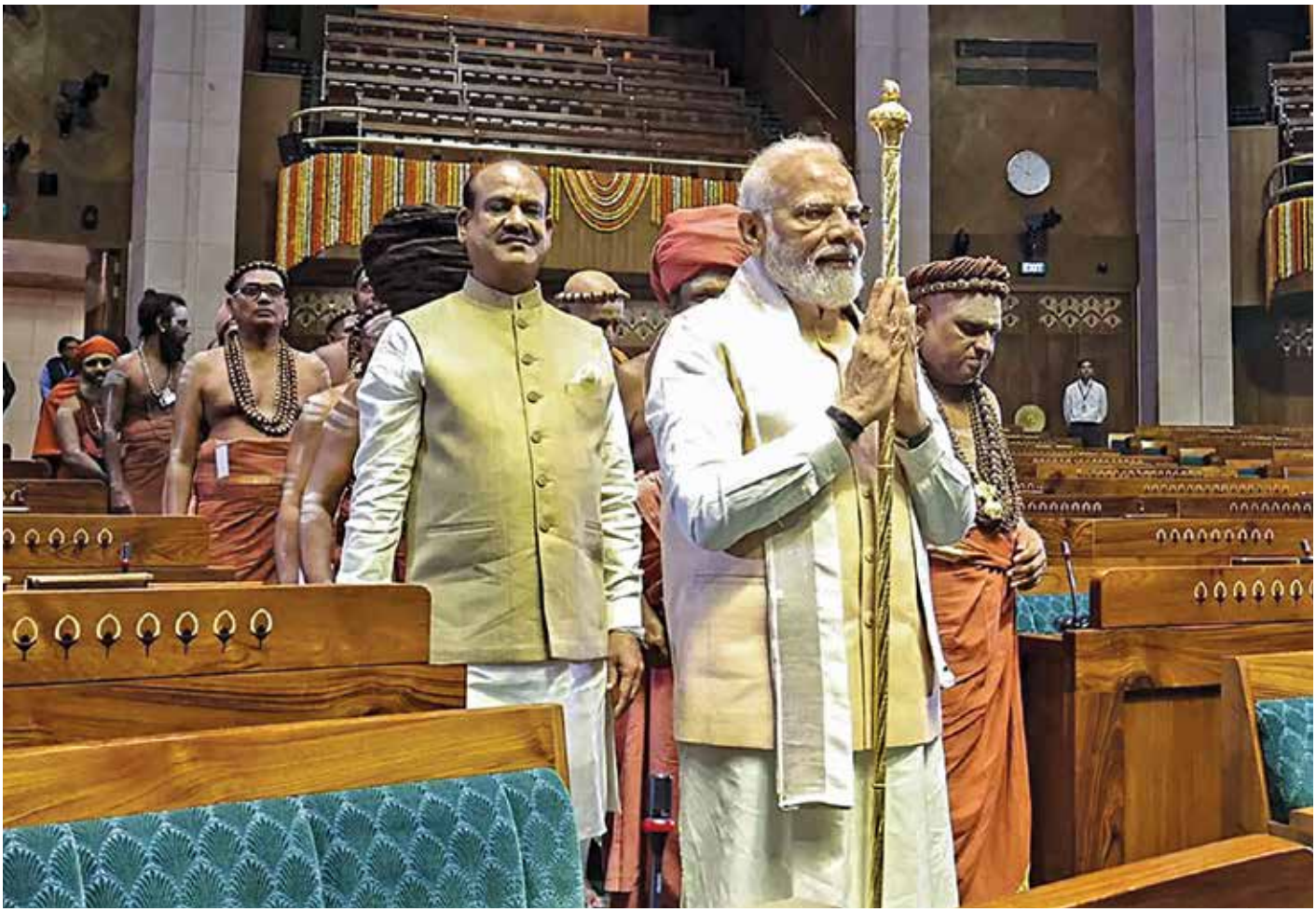

সংসদে সেঙ্গল

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন

বিনয়ভূষণ দাশ

নেহরু সংগ্রহশালার 'সোনার ছড়ি' নয় সেঙ্গল! ন্যায় এবং সুশাসনের প্রতীক সেঙ্গল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক সেঙ্গল। রাজদণ্ড ও ন্যায়ের প্রতীক সেঙ্গল। স্বাধীনতার পর ৭৫ বছর অপেক্ষা করতে হল সেঙ্গল-কে, সম্মান পেতে! প্রতিষ্ঠা পেতে! নতুন ভারতের নতুন সংসদে অবশেষে সেই ন্যায়দণ্ডের প্রতিষ্ঠা করলেন নরেন্দ্র মোদী।

গত ২৮ মে প্রধানমন্ত্রী দ্বারা নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক 'সেঙ্গল' স্থাপন এক যুগান্তকারী অধ্যায়। লোকসভার স্পিকারের পাশে 'সেঙ্গল' বা রাজদণ্ড স্থাপন এক ইঙ্গিতবাহী শুভসূচনা। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত চোল সাম্রাজ্যে এক রাজার থেকে অন্য রাজার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক হিসেবে এই 'রাজদণ্ডের' ব্যবহার হত। আমরা 'রাজদণ্ড' কথাটার সাথে ছোট থেকেই পরিচিত। কিন্তু 'সেঙ্গল' কথাটি তুলনায় অনেকটাই অপরিচিত। সেঙ্গলের ঐতিহ্যগত ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তাই শব্দটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সেঙ্গল শব্দটি তামিল 'সেম্মাই' থেকে এসেছে। সেম্মাই শব্দটির অর্থ হল ন্যায়পরায়ণতা। আর সেঙ্গল শব্দটির অর্থ হল, ধর্মদণ্ড বা ন্যায়দণ্ড। এটা শাসকের সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনের প্রতীক নির্দেশ করে। প্রাচীন চোল সাম্রাজ্যে এই রাজদণ্ড বা ন্যায়দণ্ড তুলে দেওয়া হত নতুন রাজার হাতে আর নির্দেশ দেওয়া হত, সঠিকভাবে, ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজধর্ম পালন করার। সেঙ্গল আসলে

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক। তামিলনাড়ুর কমপক্ষে দুটি সঙ্গম কাব্যথিরুবল্লুবর রচিত 'থিরুক্কুরাল' এবং ইলাঙ্গো আদিগল রচিত 'শিলাপত্তিকরম' কাব্যদুটিতে 'সেঙ্গলের' মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। থিরুক্কুরলে 'সেঙ্গন্মাই' নামক এক অধ্যায়ে সেঙ্গলের গুরুত্বগাথা বর্ণিত হয়েছে। একই ভাবে শিলাপত্তিকরমে সেঙ্গলের তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেঙ্গল সোনা ও রুপো দিয়ে তৈরি এবং এটি নানান মূল্যবান পাথর দিয়ে অলংকৃত। সেঙ্গলটি পাঁচ ফুট উচ্চ এবং এর মাথার উপর শিবের বাহন নন্দীর অবস্থান। এই নন্দী হল ন্যায়ের প্রতীক। অধীনম অধ্যক্ষ পাঁচ ফুট উচ্চতার সেঙ্গল তৈরির নির্দেশ দেন তখনই। তৎকালীন মাদ্রাজের স্বর্ণকার ভি বঙ্গারু চেট্টিকে দিয়ে এই সেঙ্গল তৈরি করা হয়। তিনজনের একটি গোষ্ঠী যাতে ছিলেন অধীনমের উপাধ্যক্ষ, নাদস্বরম বাদক রাজারত্নম পিল্লাই এবং অদুভার। তাঁরা সেঙ্গলটি নিয়ে এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজে যান। সেখানে তাঁরা সেঙ্গলটি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে দেন এবং পরে ফিরিয়ে নেন। সেঙ্গলটি গঙ্গাজলে পবিত্র করা হয়। তারপর সেটা শোভাযাত্রা করে জওহরলাল নেহরুর পৈত্রিক আবাস আনন্দ ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৪ই আগস্ট রাত্রে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং অন্য অনেকের সমক্ষেই তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্য পুরোহিত 'সেঙ্গলটি' নেহরুকে হস্তান্তরিত করেন। এটা তামিলনাড়ুর সমস্ত ধর্মীয় মঠের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন জওহরলাল নেহরুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চান, ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষ্যে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে কিনা এবং এই উপলক্ষ্যে কোনও বিশেষ প্রতীক ব্যবহার করা হবে কিনা? জওহরলাল তখনই কোনও উত্তর না দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর সাথে পরামর্শ করেন। রাজাজী দাক্ষিণাত্যের চোল সাম্রাজ্যে প্রচলিত একটি প্রথার উল্লেখ করেন যেখানে এক রাজার হাত থেকে অন্য রাজার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় একটা রাজদণ্ড বা স্বর্ণদণ্ড হস্তান্তর করা হত। এটি তামিলনাড়ুর সমস্ত প্রধান মঠাধীশ দ্বারা পবিত্র করা এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এর অর্থ, নতুন রাজা ধর্ম অবলম্বন করে ন্যায়ের সাথে তাঁর রাজ্য পালন করবে। রাজাজী তামিলনাড়ুর সমস্ত ধর্মীয় মঠের থিরুভাদুথুরাই অধীনম মঠের মঠাধ্যক্ষদের কাছে আবেদন করেন। এই অধীনমগুলি হল শৈব মতাবলম্বী। পাঁচশো বৎসরের বেশি সময় ধরে এই অধীনমগুলি ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছে। কিন্তু এই ইতিহাস ভারতবাসীর অজানা, এটি দেশবাসীকে জানতে দেওয়া হয়নি। এই সেঙ্গলটি প্রয়াগরাজের জওহরলালের পৈত্রিক আবাস আনন্দভবনের সংগ্রহালয়ে সামান্য একটি সোনার লাঠি যেটি জওহরলাল ব্যবহার করতেন বলে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার বিষয় হল, জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর পার্ষদদের চিরাচরিত নীতিই ছিল ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যতটা সম্ভব চেপে দেওয়া অথবা লুকিয়ে রাখা। এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। দেশের নাগরিকদের জানতে দেওয়া হয়নি যে এই রাজদণ্ড বা 'সেঙ্গল'টি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক; ন্যায় এবং সুশাসনের প্রতীক। প্রয়াগরাজের ওই নেহরু সংগ্রহশালায় এটিকে নেহাতই একটি 'সোনার ছড়ি' হিসেবে

স্বাধীনতা ও দেশভাগের ৭৫ বৎসর পর অবশেষে রাজদণ্ড ও ন্যায়ের প্রতীক 'সেঙ্গল'টি ভারতের নতুন সংসদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্থাপন করলেন। স্থাপিত হয়েছে সংসদ পরিচালক স্পিকারের আসনের ঠিক পাশেই। স্পিকার সংসদে 'ন্যায় এবং সাম্যের প্রতীক', তাই স্পিকারের আসনের পাশেই এটি স্থাপন করা নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এটি যে নেহাৎ সোনার ছড়ি নয় সেটা নানান ভাবে প্রমাণিত হয়। প্রকাশিত একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কথিত 'সেঙ্গল'টি হাতে ধরে আছেন; তাঁর পাশেই তামিলনাড়ুর মঠাধীশ কুমারস্বামী থাম্বিরন দাঁড়িয়ে আছেন। এছাড়াও আরও কিছু চিত্রে নেহরুকে সেঙ্গলটি হাতে ধরে রাখা অবস্থায় দেখা যায়। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, ১৯৫৯ সালে জওহরলাল নেহরুর জীবিতকালেই প্রকাশিত মাইকেল ব্রেখারের লেখা তাঁর জীবনী, 'Nehru A Political Biography' গ্রন্থটির ৩৮০ পৃষ্ঠায় একটি দণ্ড হাতে নেহরুকে দেখা যাচ্ছে যেটা কথিত 'সেঙ্গল'ই।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের ৭৫ বৎসর পর অবশেষে রাজদণ্ড ও ন্যায়ের প্রতীক 'সেঙ্গল'টি ভারতের নতুন সংসদ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্থাপন করলেন। স্থাপিত হয়েছে সংসদ পরিচালক স্পিকারের আসনের ঠিক পাশেই। স্পিকার সংসদে 'ন্যায় এবং সাম্যের প্রতীক', তাই স্পিকারের আসনের পাশেই এটি স্থাপন করা নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একই সঙ্গে নতুন সংসদ ভবন 'সেন্ট্রাল ভিস্তা'র উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদী। পবিত্র বেদমন্ত্র পাঠ ও পুজা পাঠের মাধ্যমে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন নানান মঠের সাধুসন্ত এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্পিকার ওম বিড়লাসহ অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিশিষ্টজনেরা। পুরনো সংসদ ভবনের উদ্বোধনের সময় কোনও ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি, কোনও ভারতীয় রীতি মেনে চলা হয়নি। নতুন সংসদ ভবন কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতি মেনে, বেদ মন্ত্রোচ্চারণ ও পুজাপাঠের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছে; স্থাপন করা হয়েছে ভারতীয় শাসনের প্রতীক, রাজদণ্ড বা 'সেঙ্গল'। বাস্তবিকই নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন ও সেখানে ন্যায়ের প্রতীক সেঙ্গল স্থাপন ঔপনিবেশিক মানসিকতামুক্ত এক নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত করে।

ফিশফ্রাই জোট নিয়ে তীব্র আক্রমণ অমিতাভ চক্রবর্তীর

অমিতাভ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি

প্রশ্ন: রাজ্য বিজেপির মুখপত্র 'বঙ্গ কমলবার্তা' বহুদিন পরে আবার নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে। আপনার প্রতিক্রিয়া?

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক খবরাখবর রাখতে ভালবাসেন। এবং মতামত প্রকাশের জন্য রাজনৈতিক দলের অবশ্যই একটি মাধ্যম থাকা উচিৎ। অনেকদিন হল 'বঙ্গ কমলবার্তা' প্রকাশ হচ্ছিল না। বন্ধ ছিল। আমরা চাই খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হোক এই পত্রিকা। নিয়মিত প্রকাশ হলে আমাদের সকল কার্যকর্তাই অত্যন্ত আনন্দিত হবেন এবং সবাই মনেপ্রাণে চাইছেন 'বঙ্গ কমলবার্তা' নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন: 'বঙ্গ কমলবার্তা' পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাধারণ কর্মীদের কাছে কী বার্তা দেবে?

উত্তর: প্রায় প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, অন্যান্য রাজ্য সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে ন্যারেটিভ তৈরি হয়, তাকে কাউন্টার করে পার্টির যে মতামত বা পার্টি কী চায় তা যদি বঙ্গ কমলবার্তা প্রকাশ করে তাহলে সাধারণ মানুষ এবং পার্টি কর্মীরা আসল সত্যটা জানতে পারবেন। তৃণমূল তথা বিরোধী দলগুলির মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমুলক প্রচারের বিরুদ্ধে বড় ভূমিকা নেবে এই পত্রিকা। যাতে লাভবান হবেন সর্বস্তরের কার্যকর্তারা।

প্রশ্ন: পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্য বিজেপি কেমন ফল করবে?

উত্তর: আমাদের কার্যকর্তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করছেন। লড়াই ছাড়া এক বিন্দু মাটিও আমরা সরকার পক্ষকে ছাড়ব না। ২০১৮তে আমরা তৃণমূলের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। এবার তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি প্রতিরোধ দেবেন আমাদের কার্যকর্তারা। ঠিকঠাক লড়াই হলে, নিশ্চিতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি খুব ভাল ফলাফল করবে।

প্রশ্ন: ২০২৪এ লোকসভা ভোট। ২০১৯-এর ফলাফল কি ধরে রাখতে পারবে রাজ্য বিজেপি?

উত্তর: ২০১৯-এর তুলনায় আগামী লোকসভা নির্বাচনে আরও ভাল ফলাফল করবে বিজেপি। ৩৫টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। বর্তমানে রাজ্য সরকারের শোষণ-তোষণ এবং অপশাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আজ রাজ্য সরকারের প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। এবং সেটা যে হয়েছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যখন জোর করে লোকজন ধরে এনে সভাসমিতি করতে হচ্ছে তৃণমূলকে। পুলিশ প্রশাসন দিয়ে জোর করে তৃণমূল তার সংগঠনকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। পুলিশকে বাদ দিলে তৃণমূল এখন জিরো। মমতা ব্যানার্জিরও সেই ক্রেজ আর নেই। দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলকে প্রত্যাখান করেছে রাজ্যের মানুষ।

প্রশ্ন: সিপিএমের 'বিজেপি-তৃণমূল' সেটিং তত্ত্বের প্রচার নিয়ে কী বলবেন?

উত্তর: 'বিজেপি-তৃণমূল' সেটিং তত্ত্ব অনেকটা জলের সঙ্গে তেল মেশানোর মত। স্বাভাবিকভাবেই একটা অলীক কল্পনা। নবান্নে 'ফিশফ্রাই' কিন্তু বিজেপি খেতে যায়নি। গিয়েছিল সিপিএম। এই ফিশফ্রাই জোটে বিজেপি নেই এবং মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন এই ফিশফ্রাই জোটের অপপ্রচার মানুষ বিশ্বাস করে না। বগটুই কাণ্ডে তৃণমূলের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই ছিল। সেই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে সিপিএম যায়নি। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ন্যায়বিচারের জন্য বিজেপি এগিয়ে গিয়েছিল। এখনও চলছে সেই লড়াই।

প্রশ্ন: ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে কী ফল আশা করেন? আসবে ক্ষমতায় বিজেপি?

উত্তর: ২০২৪-এই এ রাজ্যের সরকার বুঝে যাবে, ২০২৬-এ তাঁদের কী পরিণতি হবে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনেই মানুষ তৃণমূলকে এমন জায়গায় দাঁড় করাবে যে তাঁরা অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগবে। ইতিহাস বলে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনও রাজনৈতিক দলকে কখনও সহজে সমর্থন দেয় না। ৪০ শতাংশ মানুষের সমর্থন আমরা পেয়েছি। ৪৫-৫০ শতাংশ সমর্থনের জন্য আমাদের কার্যকর্তারা দিনরাত লড়াই করছেন। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবে ভারতীয় জনতা পার্টি।

লোকসভা নির্বাচনে ধূলিসাৎ করব তৃণমূলকে: সুকান্তের হুঙ্কার

সুকান্ত মজুমদার, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি

প্রশ্ন: রাজ্য বিজেপির মুখপত্র 'বঙ্গ কমলবার্তা' বহুদিন পরে আবার নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে। আপনার প্রতিক্রিয়া?

উত্তর: নিজস্ব মতাদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যেকোনও রাজনৈতিক দলের একটি পত্রিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলায় যারা বিজেপি সংগঠন করেন এবং সাধারণ মানুষজনের কাছে বিজেপির নীতি, আদর্শ এবং নরেন্দ্র মোদীর কাজের ধারা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেবে 'বঙ্গ কমলবার্তা'।

প্রশ্ন: 'বঙ্গ কমলবার্তা' পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাধারণ কর্মীদের কাছে কী বার্তা দেবে?

উত্তর: বহু মানুষ ২০১৪ সালের পর ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের অনেকেরই পার্টির নীতি-আদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। 'বঙ্গ কমলবার্তা' তাঁদের তত্ত্বগত বেস তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

প্রশ্ন: 'বঙ্গ কমলবার্তা' পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে কী বার্তা বহন করবে?

উত্তর: একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের হত্যাকারী তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণকে তুলে ধরবে। অন্যদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, বিশ্বের দরবারে সম্মান পাচ্ছে এবং তাঁর সময়কালে জিডিপির বৃদ্ধি থেকে অর্থনৈতিক উন্নতি— সব কিছু সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক তথ্য সহকারে প্রকাশ করবে 'বঙ্গ কমলবার্তা'।

প্রশ্ন: পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্য বিজেপি কেমন ফল করবে?

উত্তর: যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচন হয় তাহলে আমরা ভাল ফল করব বলে আশাবাদী। আমরা গতবার প্রায় ৬০০০ খানেক আসনে জিতেছিলাম। আমি মনে করি, ভারতীয় জনতা পার্টি এবারের নির্বাচনে গতবারের তুলনায় অনেক বেশি আসনে জিতবে।

প্রশ্ন: ২০২৪এ লোকসভা ভোট। ২০১৯-এর ফলাফল কি ধরে রাখতে পারবে রাজ্য বিজেপি?

উত্তর: মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রায় এক বছর বাকি। এ মুহূর্তে আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি, ভারতীয় জনতা পার্টি এরাজ্যে ৩৫টির বেশি আসন নিয়ে রেকর্ড গড়তে চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমরা ধূলিসাৎ করব।

প্রশ্ন: সিপিএমের 'বিজেপি-তৃণমূল' সেটিং তত্ত্ব নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া?

উত্তর: এ হচ্ছে সাধু ও চোরের গল্পের মতো। সাধু দেখছেন একজন সকালবেলায় স্নান করছে। সাধু ভাবছেন, স্নান সেরে উনি তপস্যায় যাবেন। আর যে স্নান করছে সে সাধুকে দেখে ভাবছে, এ নিশ্চয়ই আমার মতো সারারাত চুরি করে স্নান সেরে বাড়ি ফিরছে। যার যেরকম মন হয়, সে সেরকম ভাবে। আমাদের বিরোধী যারা আছে, তৃণমূল ও সিপিএম, তাঁরা সেটিং করে চলেন এবং তাঁদের সেটিং হচ্ছে পেট্রোডলারের সেটিং। সেকুলারিজমের সেটিং। এই সেটিং-এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমাদের কারো সঙ্গে সেটিং নেই এবং প্রয়োজনও নেই। আগামীদিনে রাজ্যে আমরাই সরকার গঠন করব।

প্রশ্ন: ২০১৬-র থেকে ২০২১-এ ভাল ফলাফল বিজেপির। তবু হতাশ কর্মী সমর্থকরা ২০২১-এ ক্ষমতায় না আসতে পারার জন্য। ২৬-র জন্যে কী বার্তা?

উত্তর: ২০২১-এ আমরা বলেছিলাম, ২০০র বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসব। আমরা পারিনি। অভিজ্ঞতা কম থাকার কারণে বেশ কিছু আসন আমরা হারিয়েছি। কিন্তু আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আমাদের কর্মীদের যে মন ভেঙে গিয়েছিল তাঁরা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নই তার প্রমাণ। ২০২৬ সালে... বা ২০২৬ সালের আগেই যদি বিধানসভা নির্বাচন হয় আমি অবাক হব না... সেই নির্বাচনে সরকার গঠন করবে ভারতীয় জনতা পার্টি।

স্কুলশিক্ষা

দুর্নীতি বেনিয়ম আর স্বজনপোষণের নবজোয়ার

অভিরূপ ঘোষ

সিস্টেমে কিন্তু ওদের দুর্নীতি নেই। দুর্নীতিটাই এখন ওদের সিস্টেম। ৪৬ বছরের কুশাসনে শিক্ষা এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে ময়দানে। 'আব্বু-আম্মি'-র সরকারের কাছে ক্ষুদিরাম সন্ত্রাসবাদী আর পাঠ্যপুস্তকে সুপারহিরো তৃণমূলের পার্থ। শিক্ষা দপ্তরের মাথারা এখন জেলে। দুর্নীতির মাথায় আসলে কারা? উঠে এসেছে দুটো নাম— 'ডিডি' আর 'আর কে'! কারা এরা? বাংলা সোজা বাংলাতেই তো জানতে চায়।

মহামতি গোখলে একদা বলেছিলেন 'বাংলা আজ যা ভাবে, সারা ভারত তা কালকে ভাববে'। ভুল বলেননি তিনি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র-স্বামী বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পর্যন্ত অজস্র মহাত্মার পুণ্যপদস্পর্শে বাংলা একদিন দেশের প্রথম সারিতে অবস্থান করত। আর আজ! প্রথমে ৩৪ বছরের অন্ধকারময় অপশাসন আর তারপরে ১২ বছরের পাচার, কাটমানি, দুর্নীতি ও মিথ্যাবাদের সরকার, রাজ্যের নাম একদম তলানিতে নিয়ে গিয়ে ঠেকিয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতি থেকে স্বাস্থ্য-শিক্ষা— যে কোনও ক্ষেত্রে নজর রাখলে পরিষ্কার বোঝা যায় এই ৩৪+১২=৪৬ বছরের কুশাসন বাংলাকে ঠিক কতটা পিছিয়ে দিয়েছে।

বলা হয় কোনও জাতিকে শেষ করতে গেলে ইতিহাস ভুলিয়ে তার শিক্ষার মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিতে হয়। বিগত বাম সরকার বিপুল উদ্যমে এ কুকাজ শুরু করেছিল আর ততধিক উদ্যমে তা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বর্তমান তৃণমূল সরকার।

ক্ষমতায় এসেই প্রথম যে কাজ তৃণমূল করেছিল তা হল শিক্ষার আরবীকরণ। আব্বু-আম্মি থেকে ফুফা বা নানির মত শব্দ অবাধে প্রবেশ করে পাঠ্যপুস্তকে। 'রামধনু' হয়ে যায় 'রংধনু'। সাহিত্য থেকে গণিত বা বিজ্ঞান অব্দি যে কোনও বিষয়ে উদাহরণ বা অনুশীলনীতে নির্বিচারে ভরে দেওয়া হয় আরবী নাম। তৃণমূল সরকার অবশ্য এখানেই থামেনি। তারা ক্ষুদিরামের মতো মহান বিপ্লবীকে বানিয়ে দেয় সন্ত্রাসবাদি আর সিঙ্গুর আন্দোলনকে বইয়ের পাতায় তুলে এনে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে করে

আদালতে দাঁড়িয়ে সিবিআই জানিয়েছে শুধুমাত্র স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শেষ কয়েক বছরে বেআইনিভাবে নিয়োগ পেয়েছে কম করে একুশ হাজার জন আর কমপক্ষে ন'হাজার ওএমআর উত্তরপত্রে কারচুপি হয়েছে এই সময়ে। প্রাইমারিতে সংখ্যাটা আরো বেশি বৈ কম হবে না।

দেয় পাঠ্যপুস্তকের সুপার হিরো।

যদিও এসব ঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তৃণমূল এবং তার সর্বোচ্চ নেত্রী 'দুধ দেওয়া গরু'র সাথে তুলনা করে অপমান করেন সেই সম্প্রদায়কে ভুল বুঝিয়ে মন পাওয়ার চেষ্টা তিনি করবেন এটা জানাই ছিল। যেমন জানা ছিল গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরতে অভ্যস্ত তৃণমূল পরিচালন সমিতির নির্বাচন তুলে দিয়ে নিজের পোষা অনুগত ক্যাডারদের সেখানে স্থান দেবে বা ছাত্র সংসদ নির্বাচন তুলে দিয়ে সেখানে নিজের গুন্ডা বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব দেবে। বস্তুত রাজ্যে এমন কোনও কলেজ নেই বললেই চলে যার মাথায় তৃণমূলের কোনও এমএলএ, এমপি বা নেতা বসে নেই। একইভাবে রাজ্যের প্রায় প্রতিটা স্কুলের পরিচালন সমিতির সর্বত্র তৃণমূলের নেতা থাকা এখন প্রায় একপ্রকার বাধ্যতামূলক। এখন প্রশ্ন হল শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বত্র তৃণমূল নেতাদের এই অবাধ বিচরণের কারণ কী? কারণ একটাই। তা হল পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি তথা তোলাবাজি-কাটমানি খাওয়াকে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়া।

পাঁকে যেমন পদ্ম ফোটে, তেমনই দুর্নীতির তৃণমূল সরকারেও মেরুদণ্ড সোজা রেখে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন এই জমানার প্রথম চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মন্ডল। উত্তরপত্রের কার্বন কপি দেওয়া বা স্বচ্ছভাবে সবার নাম্বারের বিন্যাস ওয়েবসাইটে তুলে দিয়ে তিনি সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ফল? তৎকালীন তৃণমূলের অঘোষিত নাম্বার টু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অপমানিত হওয়া এবং পদ খোয়ানো। আসলে যাদবপুরের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক চিত্তবাবুর সাথে এরকম ব্যবহার করে তৃণমূল বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল কেউ সততার সঙ্গে নিজের কাজ করতে গেলে তাঁর কীরূপ পরিণতি হতে পারে এই সরকারের আমলে। স্বাভাবিক যে এর পরের নিয়োগগুলো আর কোনওভাবেই স্বচ্ছতার ধারে কাছে আসবে না।

এখন নিয়োগ হয়েছে কতটুকু সেটা মূল প্রশ্ন।

২০১১-২০২৩ অব্দি বারো বছরের শাসনকালে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের জন্য শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে মোটে দুবার— প্রথম ২০১৩-১৪ সালে (পরীক্ষা ২৯.০৭.২০১২) আর একবার ২০১৮-১৯ সালে (পরীক্ষা ২৭.১১.২০১৬)। আর তারপর যেটা হয়েছে সেটা বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য। পরীক্ষার নোটিশ বেরোবে বলে একটা নোটিশ বের করে সরকার, সেটাও এক বছরের বেশি সময় হয়ে গেল। পরীক্ষার নোটিশ যদিও আর বের হয়নি।

হাইস্কুলের জন্য বাকি রইল আপার অর্থাৎ উচ্চ প্রাথমিকের জন্য নিয়োগ। দুর্ভাগ্য, বঙ্গের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের। এই দীর্ঘ বারো বছরে একবারও উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ করেনি সরকার। একটা নোটিশ বেরিয়েছিল ২০১৫ সালের জুনে। পরীক্ষাও হয়েছিল ১৬.০৮.২০১৫ তারিখে। তারপর আট বছর কেটে গেলেও সে পরীক্ষার চূড়ান্ত পরিণাম আজও জানা যায়নি।

প্রায় একই অবস্থা প্রাইমারিতেও। ২০১৪, ২০১৭, ২০২০ আর ২০২১ সাল মিলিয়ে মোট চারবার নিয়োগ হয়েছে প্রাইমারিতে। এখানে প্রধান সমস্যা যদিও শুধু নিয়োগ নয়— সেই নিয়োগের দুর্নীতি। কীরকম? জানলে অবাক হতে হয়।

তৃণমূল সরকারের আমলে প্রথম এসএসসি আর প্রথম প্রাইমারি বাদ দিয়ে বাকি একটা শিক্ষক নিয়োগের এসএসসি, একটা নন-টিচিং অর্থাৎ অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের এসএসসি আর তিনটে প্রাইমারি এখন সিবিআইয়ের র‍্যাডারে। আদালতে দাঁড়িয়ে সিবিআই জানিয়েছে শুধুমাত্র স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শেষ কয়েক বছরে বেআইনিভাবে নিয়োগ পেয়েছে কম করে একুশ হাজার জন আর কমপক্ষে ন'হাজার ওএমআর উত্তরপত্রে কারচুপি হয়েছে এই সময়ে। প্রাইমারিতে সংখ্যাটা আরো বেশি বৈ কম হবে না। এই ব্যাপক বেআইনি নিয়োগের মধ্যে কেউ পরীক্ষা দেয়নি, কেউ ইন্টারভিউ দেয়নি, কারুর ফাঁকা খাতায় নাম্বার দেওয়া হয়েছে, কারুর অ্যাকাডেমিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বা কারুর জন্যে অন্যের নাম্বার কমিয়ে

BENGAL TEACHERS' RECRUITMENT 'SCAM'

Rs 20 crore seized as ED raid houses of 2 ministers, other

Cash recovered from residence of Partha Chatterjee's close aide: Ag

EXPRESS NEWS SERVICE
KOLKATA, JULY 22

The Enforcement Directorate (ED) on Friday conducted raids at 14 locations, including the residences of West Bengal ministers Partha Chatterjee and Paresh Adhikary, and a Trinamool Congress MLA among others, as part of its investigation into the alleged scam in the recruitment of teachers by the School Service Commission (SSC).

The central agency claimed to have seized Rs 20 crore from the house of Arpita Mukherjee, a close associate of minister Partha Chatterjee as nearly 80-90 of its personnel carried out search operations across the state.

A photo provided by ED shows the seizure of Rs 20 crore cash from the premises of an aide of Partha Chatterjee, Friday.

দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী যার পরবর্তীতে চাকরি চলে যায় এমনকি বেতনও ফেরত দিতে হয়। রাজ্য তথা দেশের ইতিহাসে সম্ভবত তৃণমূল সরকার প্রথম, যারা নিয়োগ দিয়েছে এসএমএসে, রাতারাতি। কোনও প্যানেল নেই, নিয়োগপত্র নেই তবু চাকরিতে যোগ দিয়েছে হাজার হাজার শিক্ষক। এসআই বা ডিআই অফিস সব বুঝেও উপরতলার চাপে বা অন্য বিশেষ কারণে মুখ বুজে তাদের জয়েন করানোয় গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছে।

প্রশ্ন হল 'উপরতলা' কে বা কী বা কারা?

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্য অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন তৎকালীন শিক্ষক নিয়োগের প্রধান পরামর্শদাতা শান্তিপ্রসাদ সিনহা, সেই

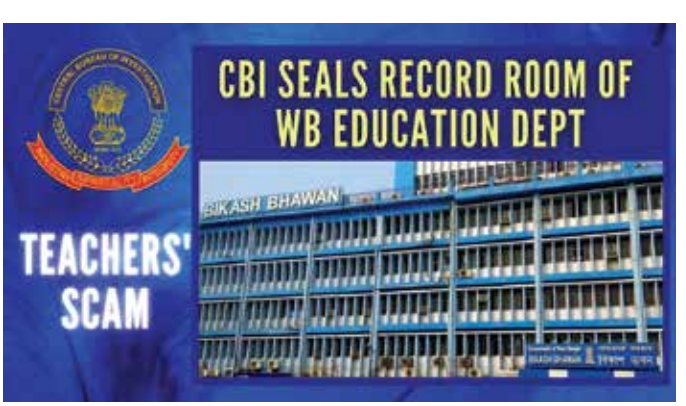

বাস্তব সত্য হল কেন্দ্রের করা নতুন শিক্ষা আইনে সরকারি স্কুলেই অনেক আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা (যেমন কোডিং আর হাতে কলমে কর্মপযোগী শিক্ষা) পেয়ে বেসরকারি স্কুলে পড়া শিক্ষার্থীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে যাবে গ্রামের সরকারি স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে বিজেপি সরকার এলে কোনও স্কলারশিপ বন্ধ তো হবেই না উল্টে আরো নতুন নতুন সুবিধা মিলবে শিক্ষার্থীদের।

সময়ের প্রাইমারি বোর্ডের প্রধান তথা তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য, তৎকালীন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণময় গাঙ্গুলি এবং একদা তৃণমূলের নাম্বার টু তথা পূর্ব মহাসচিব তথা হেভিওয়েট নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদের কারুর বান্ধবীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে আর কারুর ঘনিষ্ঠ প্রমোটারের ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেছে গুচ্ছ গুচ্ছ ওএমআর।

শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি যে এক সময়ের প্রায় গোটা শিক্ষা দপ্তরের মাথারা এখন জেলে। তাহলে কি এনারাই এই দুর্নীতির মাথা! হয়তো না। কারণ এই পুরো তদন্তে বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে দুটো নাম— 'ডিডি' আর 'আর কে'। যাঁর হাত দিয়ে প্রাইমারি দুর্নীতির অধিকাংশটাই হয়েছে বলে অভিযোগ, সেই মানিক ভট্টাচার্যের ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে মাত্র এই দু'জন ছিলেন বলে অভিযোগ। মনে করা হচ্ছে এই দুটো নামের একটা গোটা দুর্নীতির ঘাড় আর একটা মাথা। অবশ্য তৃণমূলের এই তথাকথিত নবজোয়ারের পর কোনটা

ঘাড় আর কোনটা মাথা বলা মুশকিল। তবে 'ডিডি' মানে 'দিদি' আর 'আর কে' মানে 'রাজকুমার' হলে রাজ্যের জনগণ হয়তো অবাক হবে না। আর এর কারণ খুব পরিষ্কার। মানিক ভট্টাচার্য দীর্ঘ দশ বছরের বেশি সময় কাটিয়েছেন প্রাইমারি বোর্ডের হর্তাকর্তা হয়ে। কল্যাণময় গাঙ্গুলির বয়স পেরিয়ে গিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি পদে থাকার। বিধানসভায় রীতিমত বিল পাস করিয়ে তাঁকে রেখে দেওয়া হয়। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে একেবারে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।

একইভাবে শীর্ষ নেতৃত্ব না চাইলে গ্রাম বাংলার হাজার হাজার স্কুল বন্ধ করে দিত না শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব না চাইলে হাজার দিনের উপর কলকাতার রাজপথে আন্দোলনে বসে থাকতো না যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা। একইভাবে ওনার অনুপ্রেরণা ছাড়া নিজেদের প্রাপ্য ডিএ-র দাবিতে রাস্তায় বসে থাকতে বাধ্য হতেন না শিক্ষকরা। যে রাজ্যে কয়েক হাজার ভুয়ো শিক্ষক আর অশিক্ষক কর্মীর চাকরি চলে গিয়েছিল হাইকোর্টের রায়ে সে রাজ্যের আপামর শিক্ষিত নাগরিকরা এখনও চুপ করে বসে আছেন কেন এটাই একটা চিন্তার বিষয়। যদি মেনেও নিই আদালত নিজের কাজ করছে ঠিকঠাক, যদি ধরে নিই আদালতের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে হওয়া এই তদন্তে সিবিআই নিজের কাজ করছে যথাযথ তবু নাগরিক সমাজের এই নীরবতা সত্যিই চিন্তার। আর যদি মনে হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কাজ যথোপযুক্ত হচ্ছে না তবে এই নীরবতা আরো বেশি কষ্টের।

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় একটা বড় অংশের শিক্ষিত রাজ্যবাসী মুখ বন্ধ রেখেছে মূলত তিনটি কারণে— লোভ, ভয় আর ভুল বোঝানো। লোভ দেখিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কেনা গেলেও সাধারণ মানুষকে কেনা যায় না সরাসরি। তাই তাদের জন্য রয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণতা আর ভুল বোঝানো, সাথে সুক্ষ্ম ও নোংরা রাজনীতি। যেমন বাতিল যাওয়া চাকরির তালিকায় কৌশলে অল্প কিছু যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এতে করে বিচারের নিয়মে প্যানেল এবং তাতে থাকা অনৈতিকভাবে চাকরি পাওয়া মানুষগুলোকে শাস্তি পোহাতে হচ্ছে না। কারণ বিচারের নিয়মে একশো জন অযোগ্য ছাড়া পেলেও একজন যোগ্যকে শাস্তি দেওয়া যায় না। একইভাবে প্রতিটা পরীক্ষার নোটিশ এমনভাবে করা হচ্ছে যেখানে আইনি গাফিলতির জায়গা থেকে যায়। স্বাভাবিক নিয়মে মামলা হয় আর নিয়মিত নিয়োগ করার হাত থেকে বেঁচে যায় সরকার।

এমনটা নয় যে এগুলো বোঝার বুদ্ধি নেই রাজ্যের মানুষের। আছে, বঙ্গবাসী যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু তাদের ডুবিয়ে রাখা হয় অন্য ইস্যুতে। কখনও বলা হয় নতুন শিক্ষা পলিসিতে সব বেসরকারি হয়ে যাবে আর কখনও বোঝানো হয় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সব স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ বাস্তব সত্য হল কেন্দ্রের করা নতুন শিক্ষা আইনে সরকারি স্কুলেই অনেক আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা (যেমন কোডিং আর হাতে কলমে কর্মোপযোগী শিক্ষা) পেয়ে বেসরকারি স্কুলে পড়া শিক্ষার্থীদের থেকে অনেকটা এগিয়ে যাবে গ্রামের সরকারি স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে বিজেপি সরকার এলে কোনও স্কলারশিপ বন্ধ তো হবেই না উল্টে আরো নতুন নতুন সুবিধা মিলবে শিক্ষার্থীদের। বন্ধ যেটা হবে সেটা হল সব জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়াটা। আর তৃণমূলের ভয় এটাই।

ভয় তৃণমূল পেয়েছে। তাই পুরানো শিক্ষামন্ত্রী এখন নতুন চেয়ারে। ভাবটা এমন যেন উনি সব ঠিক করে দেবেন। কিন্তু মন্ত্রী হয়ে তিনি কী বললেন! বললেন, 'তৃণমূল করলে চাকরি পাবে'। আর ওনার দলের কাউন্সিলর আর একটু এগিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যবাবুর বক্তব্য। 'ব্রাত্যদা যে কয়েকশো তৃণমূল ছেলে মেয়েকে চাকরি দিয়েছেন...'

আজ আর সিস্টেমে দুর্নীতি নেই, দুর্নীতিটাই আজ সিস্টেম। আর যতদিন এই সরকার থাকবে ততদিন এটা বদলানোর নয়।

বাংলার গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনের বিকাশ— বিজেপির অঙ্গীকার

গ্রামীণ পরিকাঠামো বিকাশে বিজেপির অঙ্গীকার

সবার সঙ্গে সবার বিকাশ— বিজেপির অঙ্গীকার

ছবিতে খবর

দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার জেলা কার্যালয়ে কার্যকারিণী বৈঠকে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী এবং পশ্চিমবঙ্গের সহ-পর্যবেক্ষক শ্রী অমিত মালব্য

বিজেপি প্রার্থী অপর্ণা বর্মণ। রাজ্যে তিনিই প্রথম বিজেপি প্রার্থী যিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতে

কুমারগঞ্জের সাফানগর অঞ্চলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে তৃণমূল থেকে ২৫টি পরিবারের বিজেপিতে যোগদান

চোরমুক্ত পঞ্চায়েত গড়বার শপথ নিয়ে আলিপুরদুয়ার বিধানসভার ১০ নং মণ্ডল শালকুমারে ৬৩টি তৃণমূল কর্মী-সমর্থক পরিবার বিজেপিকেই বেছে নিল

নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

তারাপীঠে 'বিস্তারক প্রশিক্ষণ বর্গে' সমারোপ বক্তব্য রাখছেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী

তপনের রাধাগোবিন্দ মন্দির আয়োজিত শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের বিরাট রথযাত্রায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে বালেশ্বর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি রাজ্য অফিসে ২০শে জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাজ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

চোরমুক্ত পঞ্চায়েত গড়বার শপথ নিয়ে কুমারগ্রাম বিধানসভার তুরতুরি জিপিতে ৬০টি তৃণমূল কর্মী-সমর্থক পরিবার বিজেপিকেই বেছে নিল

রাজ্যজুড়ে কৃষক আত্মহত্যার প্রতিবাদে কোচবিহারের বড় শৌলমারি অঞ্চল মাঠে, কৃষক জনসমাবেশে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর আহতদের দেখতে বালেশ্বর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো

ছবিতে খবর

প্রচণ্ড গরমে দুঃসহ লোডশেডিংয়ের সমাধানসূত্র খুঁজতে বিদ্যুৎ দফতরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের নবম বর্ষপূর্তিতে মহা জনসম্পর্ক অভিযান উপলক্ষে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠক

দঃ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে গত ২০শে জুন ২০২৩ 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়া বিধায়ক কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির ১০২ তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

বারুইপুর-এ বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগণা(পূর্ব) সাংগঠনিক জেলার জেলা কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১০২তম পর্ব শুনছেন অমিতাভ চক্রবর্তী

ওয়েস্টবেঙ্গল লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

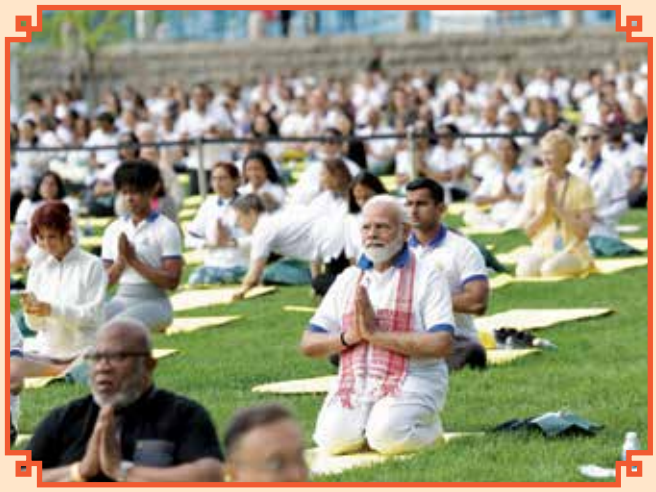

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

নবম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

নবম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সঙ্গে দিঘায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

ধুঁকছে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি

পঞ্চায়েতে হরির লুঠ

অশোক কুমার লাহিড়ি

দুয়ারে পঞ্চায়েত, শিয়রে সন্ত্রাস। পঞ্চায়েত নির্বাচন এলেই খুনোখুনি। জেলায় জেলায় তৃণমূলের বিরোধীশূন্য করে দেবার হুমকি। মুড়িমুড়কির মত বোমাবৃষ্টি। ভয় দেখিয়ে, জোর করে যেন তেন প্রকারেন পঞ্চায়েতের দখল নিতেই হবে তৃণমূলের। কিন্তু কেন? পঞ্চায়েতে বিপ্লব করতে চায় মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল। নাকি কোনও অদৃশ্য মধুর টানেই পঞ্চায়েত নিয়ে তৃণমূলের এমন অমোঘ টান!

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার যতই এগিয়ে বাংলা, এগিয়ে বাংলা বলে চিৎকার করুক, এই দাবির অসারবত্তা এটাকে জনগণের কাছে একটা নির্মম এবং নিদারুণ পরিহাসে পরিণত করেছে। রাজ্যে সর্বত্র বন্ধ কলকারখানার কবরখানা থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের করুণ পরিস্থিতি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আমাদের উর্বর জমি ও নদীনালাতে ভরা প্রদেশে কৃষি ক্ষেত্র থেকে কোনও ভালো খবর আছে কি?

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ভারতবর্ষের শুধুমাত্র ২.৭ শতাংশ জমি আমাদের প্রদেশে, কিন্তু এই ৩ শতাংশ জমির ওপর আমাদের প্রদেশের বিপুল জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ— যেটা প্রায় দেশের ৮ শতাংশের মতো— কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের ৭১ লক্ষ কৃষিভিত্তিক পরিবারের ৯৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, এবং গড়ে পারিবারিক জমির পরিমাণ ০.৭৭ হেক্টর। ক্ষুদ্র জমির উপর নির্ভরতার জন্য জমির উৎপাদকতা কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জমির উৎপাদনশীলতার ওপর নির্ধারণ করে কৃষিভিত্তিক পরিবারের দারিদ্র্য এবং মধ্যবিত্ত সচ্ছলতার সীমারেখা।

আমরা বলি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পশ্চিমবঙ্গ। তাহলে আমরা একরপ্রতি কি তত শস্যই উৎপাদন করছি যা আমাদের করা উচিত? আমাদের জমির চালের উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ একরপ্রতি উৎপাদন ২০১৭-১৮ সালে ছিল মাত্র ২,৯২৬ কেজি, যেখানে পাঞ্জাবে ছিল ৪,৩৬৬ কেজি, তামিলনাড়ুতে ৩,৯২৩ কেজি, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩,৭৯২ কেজি, হরিয়ানাতে ৩,১৮১ কেজি, এবং তেলেঙ্গানাতে ৩,১৭৬ কেজি। কেন? এর কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা। যেমন, সেচ ব্যবস্থার অভাব। ২০১৪-১৫ সালে মাত্র ৪৬.৯ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে সেই সেচের সুবিধা ছিল ৯৯.৯ শতাংশ জমিতে হরিয়ানায়, ৯৯.৭ শতাংশ জমিতে পাঞ্জাবে, ৯৮.১ শতাংশ জমিতে তেলেঙ্গানায়, ৯৭.১ শতাংশ জমিতে অন্ধ্রপ্রদেশে, এবং ৯৪.৪ শতাংশ জমিতে তামিলনাড়ুতে। জৈব এবং রাসায়নিক সারের প্রযুক্তিতেও পশ্চিমবঙ্গ এই সব প্রদেশগুলির থেকে অনেক পেছনে। তাছাড়া কৃষকরা শস্যের এবং অন্যান্য পণ্যের যথার্থ মূল্য পাচ্ছেন না। চাল-ধানের বাজার দাম MSP বা ন্যূনতম সমর্থন মূল্য পাচ্ছেন না, হিমঘর, মার্কেটিং বা বিপণনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে সবজি, আনাজ এবং ফলমূলের প্রচুর অপচয় হচ্ছে। সংবাদপত্র জানাচ্ছে 'দিনহাটার ভেটাগুড়িতে হিমঘর নেই, বিক্রি না হওয়া আনাজ ফেললেন চাষি'।

আমাদের ভারতবর্ষে প্রভূত পরিমাণে ফলমূল সবজি অপচয় হয় ফসল কাটা বা তোলার পরে। এর পরিমাণ আনুমানিক ১৩,০০০ কোটি টাকা। এবং

এই অপচয়েও এগিয়ে আমাদের বাংলা— আনুমানিক ৬ শতাংশ ফলমূল সবজি পশ্চিমবঙ্গে অপচয় হয় ফসল কাটার পর। শস্য, সবজি, আনাজ এবং ফলমূলের বিক্রি পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের পক্ষে এক বিরাট সমস্যা। বহু ক্ষুদ্র কৃষক— অনেকে মহিলা— রাস্তার ধারে কয়েক কিলো করে বিভিন্ন সবজি বিক্রি করছেন, এটা একটা পরিচিত দৃশ্য। এঁদের অনেকেই আগের দিন রাতে আসেন, পরের দিন সকালে বিক্রি করার জন্য। সকালের সুন্দর ও লোভনীয় টাটকা সবজি ও ফলমূল বিকেলের মধ্যে, বিশেষত গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে, ঝিমিয়ে, শুকিয়ে বিশ্রী রূপ ধারণ করে। ওঁরা সেগুলি জলের দামে বিক্রি করেন কিংবা ফেলে দেন। সুসংগঠিত কোনও বিক্রির সুব্যবস্থা নেই পশ্চিমবঙ্গে, নেই শ্রেণীবিভাজন অর্থাৎ বড়, ছোট, অতিউৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট ভাগে ভাগ করার, হিমঘরে মজুত করার, এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাহনে অন্য শহরে কিংবা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার বা প্রক্রিয়াকরণ বা প্রসেসিংয়ের উপায়।

২০১১ সালে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষকদের জন্য লড়াই করে ক্ষমতায় আসার পর, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কৃষক বাজার প্রকল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু যথারীতি, এটাও ছিল জনমোহিনী ভোট পাওয়ার আর এক প্রচেষ্টা। রোগ নির্ণয় বা ডায়াগনসিস ছিল ভুল, এবং ওষুধ অনুপযোগী। এতে তাঁবেদার কিছু ঠিকেদার উপকৃত হলেন, কৃষকরা নন। প্রতিষ্ঠিত বাজারের থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এই নবনির্মিত কৃষক বাজার অনেক জায়গাতেই— যেমন গোসাবায়— পরে আছে পরিত্যক্ত অবস্থায়।

সমস্যা শুধু আনাজের এবং দিনহাটার নয়, সমস্যা দুধ, ডিম এবং মাছের। মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল সরকারের শাসনে সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা পশ্চিমবঙ্গে দুধ, ডিম এবং মৎসের পর্যাপ্ত উৎপাদন হচ্ছে না। মাছে-ভাতে বাঙালির মাছ আসছে অন্যান্য প্রদেশ থেকে, দুধ তৈরি হচ্ছে অন্য প্রদেশের মিল্ক পাউডার থেকে। কৃষকের আয় বাড়াতে 'শ্বেত বিপ্লব'-এর ঘোষণা করেছিলেন মমতা কিন্তু রূপায়িত হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে এগিয়ে বাংলা, কিন্তু আসলে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় মুখ থুবড়ে পড়েছে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি। খেতমজুর কাজ পাচ্ছেন না। গ্রামবাংলায় বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। মাঠে অথবা কারখানায় কাজ নেই গ্রামের গরীব ও মধ্যবিত্তের। কাতারে, কাতারে বাংলার মানুষ যাচ্ছে অন্য প্রদেশে। শুধু রুজি-রোজগারের সন্ধানে নয়, যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য, যাচ্ছে শিক্ষার জন্য।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রাম বাংলায় পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থাগুলি কি করছে? আমরা জানি যে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি অনেক আশা করে সংবিধানের ৭৩তম সংশোধন আনা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন এবং সুশাসন চালু করার জন্য। তৃণমূল সরকারের আমলে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি পরিহাসে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্র সরকারের থেকে আরো অনেক কাজ, অনেক টাকা এবং দায়িত্ব হাতে পেতে চায়, কিন্তু নিজের এক্তিয়ারে থাকা স্বায়ত্তশাসিত গ্রামীণ এবং শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে কাজ, টাকা এবং দায়িত্ব দিতে নারাজ। স্থানীয় সংস্থাগুলি কাজ করছে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ঠিকাদার বা এজেন্সির মতো।

তহবিল, কার্যাবলী, এবং কর্মীদের হস্তান্তরিত না করার ফলে, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতিরাজ কেবল কাগজেই রয়ে গেছে। গ্রামীণ স্থানীয় বা পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থাগুলির সিংহভাগ টাকা (তিন-চতুর্থাংশ বা বারো আনা) আসে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অনুদান থেকে, রাজ্য সরকার দেয় সিকি ভাগ বা টাকায় চার আনা। স্বায়ত্ত শাসনের মূলে রয়েছে বিকেন্দ্রীকরণ। গ্রামীণ ও শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলির ক্ষমতায়ন ৭৩ ও ৭৪তম সাংবিধানিক সংশোধনির মৌলিক লক্ষ্য। এই বিকেন্দ্রীকরণে তৃণমূল সরকারের কোনও আগ্রহ নেই। আমাদের প্রদেশে সরকারের সব কিছু চলে একজন নেতার অঙ্গুলিহেলনে। সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের মতো বহুদিনের ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পার্কিং ফি নিয়ে সিদ্ধান্ত বদলাতে হল মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অপছন্দের জন্য। স্বভাবতই, গত ১২ বছরে বাংলায় পঞ্চায়েত একটি নিষ্ক্রিয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষমতায়ন না করে, গত ১২ বছরে রাজ্যের পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদগুলি চালানোর নামে দু'হাতে লুট করেছে তৃণমূল। যেমন ধরা যাক, পঞ্চায়েত এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা। ৩৪ লাখ ৬৮ হাজার ৬৮৩ জনকে বিনামূল্যে বসতবাড়ি দেওয়ার ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের তালিকায় দেখা যায়, সিংহভাগে রয়েছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের নাম। গরিব বিজেপি সমর্থকদের নাম নেই। যাঁদের পাকাবাড়ি আছে, চার চাকার গাড়ি আছে, দুই চাকার মোটরবাইক, ট্রাক্টর, টিভি, ফ্রিজ আছে, তাঁদের নামও উঠেছে।

অবস্থাপন্ন তৃণমূলের বহু নেতা-কর্মী নিজেদের পাকা বাড়ি ছেড়ে কাঁচা বাড়িতে উঠে নাম তুলেছেন। নাম তুলেছেন যৌথ পরিবারের সদস্যদের আলাদা নামে। এমনকি পঞ্চায়েত এলাকায় গরীব মানুষের আধার কার্ড এনে নিজেরা ওই নামে বাড়ি বরাদ্দ করিয়েছেন। অভিযোগ, পঞ্চায়েত এলাকায় আবাস যোজনায় নাম তোলার জন্য গরিব মানুষের কাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে তৃণমূল নেতারা। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের পর, পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতিতে বেহাল তৃণমূলের ভাবমূর্তি ফেরাতে তৃণমূলের সুপ্রিমো এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর 'কাটমানি ফেরানোর' নির্দেশ। বহুদিন পঞ্চায়েতগুলির না আছে কোনও হিসাব বা অ্যাকাউন্টস পেশ হয়েছে, না হয়েছে অডিট। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে তড়িঘড়ি শুরু হয়েছিল দীর্ঘদিন না হওয়া সেই অডিট। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে কি?

ধুঁকছে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি, পঞ্চায়েতে চলেছে এবং চলছে হরির লুঠ। এর মাশুল পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন সুদে আসলে আদায় করবে।

ভোট-ভূতদের দাপাদাপি!

নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করুন

সৌভিক দত্ত

পার্টির নাম ৭৫-২৫। রাজনৈতিক দর্শন একটাই, এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই। শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র ওরা আছে। ওদের আমলেই রমরমা হয়েছে কাটমানি ইন্ডাস্ট্রির। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, সবেতেই আছে নির্দিষ্ট রেটকার্ড। চুরিকে ওরা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মানুষ কী চায়? ৭৫-২৫এর নবজোয়ার? নাকি চোরমুক্ত পঞ্চায়েত?

বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বাজলেই শুরু হয় ভূতেদের উপদ্রব। এই ভূত মুণ্ডু চিবিয়ে খায় না। শুধু কাটমানি খায়। ভৌমিক স্তরে ক্ষমতার বিন্যাসে এই ভোট সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ! পশ্চিমবঙ্গের একেবারে ভূমিস্তরে কীভাবে প্রশাসন পরিচালিত হবে, কীভাবে মানুষের ট্যাক্সের সঠিক ব্যবহার হবে, কীভাবে সাধারণ মানুষের মূল সমস্যাগুলোকে সমাধান করা হবে তা সবই নির্ধারিত হয় এই ভোটেই।

যদি সঠিক মানুষকে নির্বাচন করা যায় তাহলে এলাকার উন্নতি হবে, মানুষ সুখে শান্তিতে থাকবে, গ্রাম বাংলার সম্পদ বাড়বে। আর যদি ভুল মানুষেরা নির্বাচিত হয় তাহলে? তাহলে স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবে। রাস্তা তৈরির টাকা - পুকুর বাঁধানোর টাকা - ড্রেন কাটানোর টাকা দিয়ে নেতাদের প্রাসাদ উঠবে, মৌজ মস্তি চলবে, চুরির টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দলবাজি হবে আর যার শেষ পরিণতি? বগটুই! উন্নয়নের চাপ না নিতে পেরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পোড়া কাবাব!

আর শুধুই কি চুরি? এতো তাও অনেক ছোটোখাটো বিষয়! আজ চুরি করবে তো কাল সুযোগ পেলেই মানুষ ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে। অথবা নিজেদের মধ্যে টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিজেরাই নিজেদের কুপিয়ে-পুড়িয়ে নিজেরাই শেষ হবে। কিন্তু এর বাইরেও যে আরও অনেক কিছু আছে যা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে দেবে, যদি না আমরা নির্বাচনে যথাযথ প্রতিরোধ তৈরী করতে না পারি তাহলে। যদি আমরা চোরেদের থেকে পঞ্চায়েত স্তরের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার না করতে পারি তাহলে।

যেমন ধরুন সরকারি চাকরিগুলো! এসএসসি বা ক্লার্কশিপ বা গ্রুপ ডি? কিংবা ওই পৌরসভার বিক্রি হওয়া চাকরিগুলো? হ্যাঁ যদিও পৌরসভা আর পঞ্চায়েত আলাদা তবুও শাসক দল তো একই। মূল কুকর্ম করা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বা দক্ষিণ কলকাতার অন্যান্য নেতারা বা স্বয়ং মাননীয়া তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। তারা তো আর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষের থেকে টাকা তোলেনি চাকরি দেওয়ার নাম করে। হ্যাঁ কাটমানির ৭৫-২৫ হিসাবে ভাগ তারা অবশ্যই নিয়েছে। কিন্তু টাকাটা তুলেছে কারা? লোকাল স্তরের নেতারাই। যাদের আমরা-আপনারা নিজেদের প্রতিবেশি ভেবে নিজেদের আপনজন ভেবে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলাম পঞ্চায়েত ভোটে। বদলে ওরা আমাদের কী দিয়েছে? আমাদের যুবসমাজের একটা গোটা প্রজন্মকেই স্রেফ পঙ্গু করে দিয়েছে। আপনার বাড়ির ছেলে - আমার বাড়ির ছেলে যার হয়তো শিক্ষক বা অন্য কোনও বড় সরকারি চাকুরে হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার ছিল সে আজ অন্য রাজ্যে চলে গিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে। আর যারা যেতে পারছে না তারা কেউ বেকারত্বের কলঙ্ক নিয়ে স্থানীয় নেতা নামধারী চোরদের উচ্চশিক্ষিত চামচা হচ্ছে। আবার কেউ বা শাসক দলকে কাটমানি দেওয়ার বদলে সারাদিন পরিশ্রম করে গায়ে গতরে খেটে পেট ভরানোর ভাত জোগাচ্ছে। অথচ তারাই হতে পারত আমাদের সমাজের এক একজন উচ্চশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত যুবক। কিন্তু তারা তা হল না।

দোষটা কাদের? দোষটা আমার আর আপনার! কারণ আমরা নির্বাচনে সঠিক প্রার্থীকে বেছে নিইনি।

পশ্চিমবঙ্গ ছিল সারা দেশের মানুষের অন্যতম গন্তব্য। কাজের আশায় সারা ভারত থেকে মানুষ এখানে ভীড় করত এখন যেমন উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটে করে। কিন্তু তারপর কী হল? শুরু হল দীর্ঘসময় ব্যাপী প্রথমে হার্মাদ আর পরে চোরেদের শাসন। পুরো রাজ্যটাকেই খেয়ে ছিবড়ে করে দিল এরা। একসময়কার শ্রেষ্ঠ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আজ ভিখিরি দশা।

বা যদি ধরি ডেমোগ্রাফির কথা! এই বিপদ তো শুধু স্থানীয় স্তরের বা শুধুমাত্র রাজ্যের না। এই বিপদ পুরো দেশের এবং কিছুক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই। আমাদের প্রতিবেশি দেশ থেকে স্রোতের মতো ঢুকে পড়ছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের মধ্যে প্রতিবেশি দেশের বাসিন্দা যেমন আছে তেমনই রোহিঙ্গারাও আছে। তাদের সবার উদ্দেশ্য একটাই। যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণে এই রাজ্যে ঢুকে রাজ্যের জনবিন্যাস পালটে দেওয়া। তারপর এখানকার আদি বাসিন্দাদের তাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় কাশ্মীর বানিয়ে সেই ভূখণ্ডকে দখল করা, যা তারা ১৯৪৭ এ দখল করতে পারেনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবল প্রতিরোধে।

আর এই পরিকল্পিত ভাবে জনবিন্যাস পরিবর্তন তথা পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তে কারা জড়িত আছে? কেন? যারা কিছু টাকার বিনিময়ে এদের রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট - প্যানকার্ড - রেশনকার্ড - আধারকার্ড করিয়ে দিচ্ছে। তারাই! অর্থাৎ পঞ্চায়েত স্তরে থাকা আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা বিগত দিনে আমাদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছিল!

এলাকার জনবিন্যাস পালটে যাচ্ছে, ভারতের ভবিষ্যৎ বিঘ্নিত হচ্ছে আমার আপনার রুটি রুজি অনুপ্রবেশকারীরা ছিনিয়ে নিচ্ছে— আর এর জন্য দায়ী কে? আমি আর আপনি। কারণ আমরা আগের নির্বাচনে আমরা ভোটটা ওদেরই দিয়েছিলাম।

কিংবা আমাদের নিজেদের স্বার্থের কথাই যদি ভাবি। একটা জাতির প্রধান মেরুদণ্ড কারা? শিক্ষক-পুলিশ-ডাক্তার-প্রফেসর এরাই তো নাকি? শিক্ষক ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা দেবেন। পুলিশ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করবেন। ডাক্তার আমাদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবেন। প্রফেসর আমাদের উচ্চ শিক্ষা দেবেন। সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোকে যা একটা জাতিকে ধরে রাখে তাকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে এই সরকার! এরা সিভিক পুলিশ করেছে, সিভিক শিক্ষক করেছে, সিভিক কলেজ অধ্যাপক (স্যক্ট) করেছে, সিভিক সরকারি কর্মচারী করেছে - এখন সিভিক ডাক্তার আর সিভিক নার্স করার দিকে এগোচ্ছে।

আর কীসের নিরাপত্তা থাকল বাঙালির? জীবিকার না শিক্ষার না সমাজের না অপরাধ নিয়ন্ত্রণের না ভাতের না স্বাস্থ্যের না - কিছুরই না। স্রেফ একটা বিরাট শূন্যতা নিয়ে জাতিগত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছি আমরা!

আর এর জন্য দায়ী কে? আপনারা অবশ্যই তা জানেন।

পশ্চিমবঙ্গ এক সময় ছিল ভারতের নেতৃত্বস্থানীয় রাজ্য। বলা হত আজ বাংলা যা ভাবে কাল গোটা ভারত তাই ভাববে। পশ্চিমবঙ্গ ছিল সারা দেশের মানুষের অন্যতম গন্তব্য। কাজের আশায় সারা ভারত থেকে মানুষ এখানে ভীড় করত এখন যেমন উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটে করে। কিন্তু তারপর কী হল? শুরু হল দীর্ঘসময় ব্যাপী প্রথমে হার্মাদ আর পরে চোরেদের শাসন। পুরো রাজ্যটাকেই খেয়ে ছিবড়ে করে দিল এরা। একসময়কার শ্রেষ্ঠ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আজ ভিখিরি দশা। পুরো রাজ্যের সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধিতে। আর সেই সম্পদ যাচ্ছে কোথা থেকে? এই পঞ্চায়েত স্তর থেকেই। ৭৫%-২৫% হিসাবে ভাগ হয়ে। ২৫% থাকছে

স্থানীয় চোরদের আর বাকি ৭৫% দক্ষিণ কলকাতার চোরদের। আর এর মাঝে পড়ে ভিখারি হচ্ছি আমরা!

কারণ আমরা সঠিকভাবে আমাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারি না। কারণ আমরা সঠিকভাবে আমাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারিনি।

এইবার আমাদের হাতে সুযোগ এসেছে আমাদের সমস্ত ভুল শুধরে নেওয়ার। ভোট দিন অবশ্যই ভোট দিন। কারণ এটা আপনার এবং আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার বিষয়। যে কোনও রকম ভয় বা হুমকিকে উপেক্ষা করেই ভোট দিন। সুখ শান্তিময় ভবিষ্যতের সামনে সাময়িক বিপদ বা চোরেদের হুমকি কোনও গুরুত্বই রাখে না।

একটা কথা মনে রাখবেন যে জাতি যেমন হয় তার শাসকও তেমনই হয়। আজ গুজরাট বা উত্তরপ্রদেশ উন্নত কারণ তারা মানে সেখানকার সাধারণ মানুষ সঠিক শাসক নির্বাচন করতে পেরেছে! তাই তারা এগিয়ে চলেছে। আর আমরা ক্রমশ ভিখারি হতে হতে শূন্যের দিকে মিলিয়ে যেতে চলেছি। এখনও সময় আছে, ঘুরে দাঁড়ানোর, এখনও সময় আছে নিজেদের হারিয়ে ফেলা গৌরব পুনরুদ্ধার করার। আর সেই চাবিকাঠি আছে আপনাদের হাতেই।

তাই ভোট-ভূতদের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে আগামী দিনেও সঠিক প্রার্থীকে ভোট দিন। পশ্চিমবঙ্গকে চোরমুক্ত করুন।

‘মমতা’ হীন গণতন্ত্র

কৌশিক কর্মকার

নির্বাচনে জিততেই হবে। বিরোধীদের আটকাতেই হবে। পঞ্চায়েত পেতেই হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী আটকাতেই হবে। হাইকোর্টে হেরে গেলে সুপ্রিমকোর্টে যেতে হবে। সেখানে গো-হারা হেরে গেলেও ২২ জেলায় নামমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর আর্জি... জিততে বাপু হবেই। প্রয়োজনে নকুলদানা পুরে দেব। নিয়ে আসব তিহার থেকে। কিন্তু জিততে হবেই। নইলে ‘নবজোয়ার’ তো তেপান্তরের ঘোড়ার ডিম!

রাজ্যে একটি নির্বাচন কমিশন আছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব তাদের কাঁধে ন্যস্ত। পাঁচ বছর পর পর পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য তারা সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ। তবে এই দায়িত্ব সবটাই নাম কা ওয়াস্তে। আদৌ কোনও নির্বাচন হল কিনা, নাকি নির্বাচনের নামে প্রহসন হল; সে নিয়ে তাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। এত এত টাকা খরচ করে নির্বাচনের আয়োজন করা হয়; অজস্র নির্বাচন কর্মী এই

উত্তপ্ত গ্রীষ্মের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন; এত খরচ, এত আয়োজন, পুরো বিষয়টির একমাত্র উদ্দেশ্য আমজনতার মতামত গ্রহণ; এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা যার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ একটি সম্পূর্ণ ভয় মুক্ত পরিবেশে তাদের সুনির্বাচিত মত প্রকাশ করতে পারেন; সেই সঙ্গে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরাই যাতে স্থানীয় সরকারগুলি অর্থাৎ পঞ্চায়েত, পৌরসভার দায়িত্বে আসীন হতে পারেন।

কিন্তু জনগণের ভোটদানের বিষয়টি অনেক দূর অস্ত! যারা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন তারাই পশ্চিমবঙ্গে মনোনয়ন দাখিল করতে পারেন না। নির্বিচার হত্যা, বোমাবর্ষণ, লুঠপাট, নারী নির্যাতন, ভীতি প্রদর্শন, হুমকির স্রোত এগুলি পশ্চিমবঙ্গীয় নির্বাচন ব্যবস্থার অন্যতম অলংকার। অথচ সারা ভারতে নির্বাচনের নামে এহেন প্রাণনাশ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করা তথা চূড়ান্ত হিংসার বহিঃপ্রকাশ, আক্ষরিক অর্থেই কোথাও দেখা যায় না। সারা দেশে এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে। নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় সারাদেশে পশ্চিমবঙ্গ এক ও অদ্বিতীয়।

কিন্তু এত হিংসা কেন? বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে এখন সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসার নাম রাজনীতি। নির্বাচনের সময় অর্থ বিনিয়োগ কর; পাঁচ বছর ধরে সেই বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভের গুড় ভোগ কর; স্বাভাবিকভাবে এহেন সুযোগ কেউ কি ছাড়তে চাইবে? তারপরে যেখানে সরকারি পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে কাটমানি নির্ভর; যেখানে কাটমানি না দিলে উপভোক্তাকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়; সেখানে এই বিশাল ব্যাপক কাটমানি সংগ্রহের হাতছানি থেকে কাউকে কি সহজে নিবৃত্ত করা যাবে? কেন্দ্রীয় সরকার দেশের দরিদ্র মানুষদের হাতে অর্থের জোগান দেওয়ার জন্য অকাতরে অর্থ প্রদান করছে। সেই অর্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্টিত হয় পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার মতো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। অসংখ্য প্রকল্পে অজস্র টাকা আসছে পুরসভা পঞ্চায়েতে। সেই টাকার সিংহভাগ ভোগদখলে বদ্ধপরিকর এই কাটমানির প্রবর্তকরা; তাই যে কোনও প্রকারে, যে কোনও উপায়ে বিরোধীদের আটকাও; মনোনয়ন তুলতে দিও না; তুলে ফেললে প্রত্যাহার করতে বাধ্য কর; প্রত্যাহার করাতে না পারলে এমন ব্যবস্থা কর যাতে নির্বাচনে তারা কোনও পোলিং এজেন্ট দিতে না পারে; বিরোধী সমর্থকদের আটকাও, ভয় দেখাও, নির্বিচারে ছাপ্পা দাও! তাও না হলে শেষে গণনার সময় কারচুপি কর; কিন্তু জিততে তোমাকে হবেই; যে কোনওভাবে বিরোধীদের আটকাতে হবে।

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের দামামা বেজে গেছে। প্রত্যাশিতভাবেই মুর্শিদাবাদ থেকে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, রাজ্যের সব জায়গা থেকে নিয়মিত হিংসার খবর আসছে। শাসক বাঁশ, লাঠি

দিয়ে বিরোধীদের পথ আটকাচ্ছে। যথেচ্ছভাবে শারীরিক নিগ্রহ করছে। পুলিশকর্মী, সাধারণ নির্বাচন কর্মী থেকে সাংবাদিক— শাসকের লাঠির স্পর্শসুখ থেকে কেউ বাদ পড়ছে না। স্বাভাবিকভাবেই যে নির্বাচনে নিরাপত্তা কর্মীদের নিরাপত্তা নেই, সেই নির্বাচনে নির্বাচকদের কোনও সুরক্ষা থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য; সেই নির্বাচন প্রহসন হতে বাধ্য। হিংসাদীর্ণ ভীতিপূর্ণ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই কোথাও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কোনও ভূমিকা এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। তারা বোবা-কালা-অন্ধের ভূমিকায় সুনিপুণ অভিনয় করে চলেছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে হিংসার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। মাত্র দু-বছর আগে যে বিধানসভা নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে, তার পরবর্তী সময়ে যে বীভৎস হত্যালীলা সারা রাজ্য জুড়ে চলেছিল, ভাবলে গা শিউরে ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকরা বিশেষভাবে বিজেপি কর্মীরা নির্বিচার হিংসার শিকার হয়েছে। অসংখ্য কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়; মহিলা কর্মীদের ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন করা হয়; এমনকি শিশুরাও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বিজেপি করার অপরাধে বহু মানুষের বাড়ি, দোকান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে; তাদের উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করা হয়েছে। এখনও বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক বাড়ি ফিরতে পারেনি। তাদের রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ডসহ যাবতীয় পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন আছে। আর এই ন্যাক্কারজনক হিংসার প্রেক্ষিতে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল সংবাদমাধ্যমের নীরবতা। বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুদ্রিত সংবাদমাধ্যম নির্বাচন পরবর্তী হিংসার যাবতীয় সংবাদ সর্বান্তকরণে গোপন করেছে; কখনও বা লঘু করেছে, ভেতরের পাতায় দু লাইনে সারতে বাধ্য হয়েছে। শাসকের যাবতীয় অপকর্মকে আড়াল করেছে। সরকারি বিজ্ঞাপন তাদের নীরব থাকতে বাধ্য করেছে। তবে আশার কথা, সাধারণ মানুষ এই 'বিক্রীত' সংবাদমাধ্যমের 'বিকৃত' খবর পরিবেশন বিষয়ে সম্যকরূপে সচেতন। 'নির্বাচন' ও 'হিংসা', এই দুটি শব্দকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সমার্থক করার পশ্চাতে তাদের ভূমিকাকে কোনও অংশেই হেয় করা যায় না।

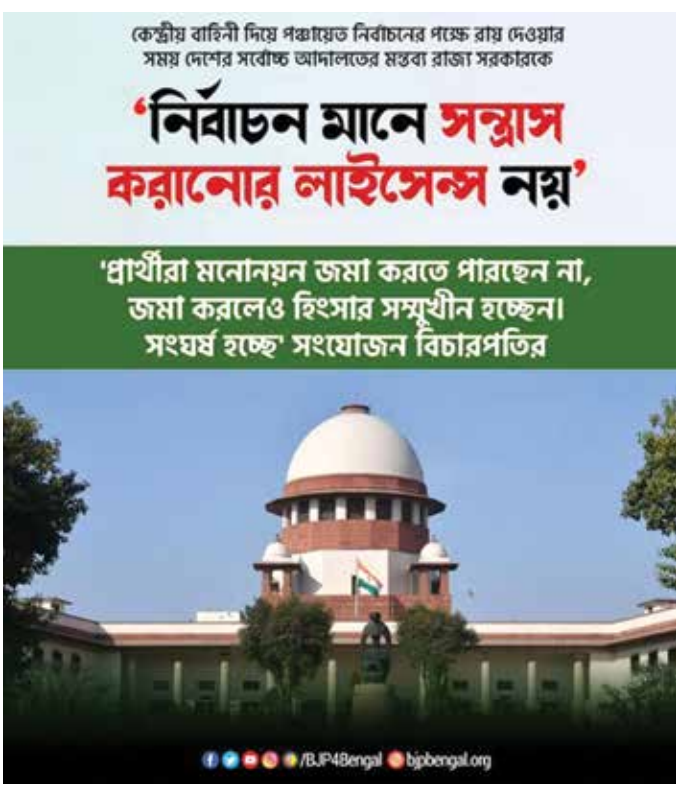

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৯ বছরেই নতুন ভারত

৫ পাতার পর

যাচ্ছে দশম থেকে পঞ্চম হয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দিকে। নতুন ভারতবর্ষ এগোচ্ছে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত রাষ্ট্রের পথে। ঝড়ের গতিতে এগোচ্ছে 'প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি জাতীয় মাষ্টার প্ল্যান'-এর অধীন সড়ক, গ্রামীণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতীয় সড়ক, রেলপথ, বিমানবন্দর, বন্দরের কাজ।

এমনটা কি ২০১৪র আগে কখনও হয়নি? না হয়নি। কিছুটা হয়েছিল নেহরু জমানার শুরুর দিকে। বাঁধ নির্মাণে। তারপর প্ল্যানিং কমিশনের কাজের পদ্ধতিতে শ্লথ হয়ে পড়ে পরিকাঠামো বিকাশের গতি। কোনও একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে অন্তত ৮-১০ বছর সময় লাগত, কখনও কখনও তার থেকেও বেশি। যেমন ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করেছেন সরযূ নদী সেচ প্রকল্প বা সরযূ নাহার ন্যাশনাল প্রোজেক্ট। ছোটবেলায় বাবার মুখে শুনেছিলাম এই প্রকল্পের কাজ। ৪৯ বছর আগে ১৯৭২এ শিলান্যাস হয়েছিল এই প্রকল্পের। একইভাবে ইউপিএ জমানার অন্তত ১০টি প্রকল্প, যা শুরু হয়েছিল তাঁদের সময়কালে, সেইসব প্রকল্পের গতি বৃদ্ধি হয় ২০১৪র পর। এখন কোনও প্রকল্পের কাজ শেষ, কোনওটার কাজ শেষের মুখে।

৯ বছরে মোদী সরকারের সময়ে পরিকাঠামো বিকাশে বদলে যাচ্ছে লাদাখ এবং কাশ্মীর। দ্রুত বদলে যাচ্ছে গোটা দেশ। প্রকল্প এখন আর পড়ে থাকেনা। ঘোষণা হবার পর দ্রুত শেষ হয় প্রকল্প। পরিকাঠামো বিকাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সময়ে যা হচ্ছে সেটা তথ্যগতভাবে ঐতিহাসিক। পরিকাঠামো বিকাশে দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই 'কর্তব্যপথে' হাঁটছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ভারতবর্ষ, এশিয়া এবং গোটা বিশ্বে— রাষ্ট্র বিকাশের ভাবনায় প্রধানমন্ত্রী মোদী শ্রদ্ধার আসন পেলেও দেশেরই একটি রাজ্য এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও মেনে নিতে পারেননি নরেন্দ্র মোদীর এই জনপ্রিয়তা। শুধু তাই নয়, মমতা ব্যানার্জির ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক রাজনীতির যাঁতাকলে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষককল্যাণ প্রকল্প থেকে এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেনি রাজ্যের দরিদ্র ও দুর্বল পরিবারগুলি। পাশপাশি যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে অর্থ এসেছিল, তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির কারণে কিছু প্রকল্পে টাকা আসা বন্ধ, কিছু প্রকল্পে হিসাব না দিতে পারলে বন্ধ হয়ে যাবে কেন্দ্রীয় সহায়তা। ইগোসেন্ট্রিক রাজনীতির কারণে আসলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে রাজ্যের মানুষ, রাজ্যের ভবিষ্যৎ, রাজ্যের উন্নয়নের বিকাশ। মানুষ কি ভুলে যাবে এই সবকিছু! সময় কি ক্ষমা করবে নেতাজি-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের বাংলার প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খামখেয়ালিপনা?

ড. শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে এত অনীহা কেন? এত বিরোধিতা কেন? হিন্দু বাঙালীকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। জিন্নার পাকিস্তানকে ভাগ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কট্টর ধর্মান্ধ সুহরাওয়ার্দির 'অখণ্ড বঙ্গ'-এর ষড়যন্ত্র ভেঙে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। পাকিস্তানে চলে যেত পশ্চিমবঙ্গ, শ্যামাপ্রসাদের তীব্র প্রতিরোধ না থাকলে! শ্যামাপ্রসাদ কি অন্যায় করেছিলেন?

মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৬ এর ১৬ অগাস্ট শুক্রবার পাকিস্তানের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) হিসাবে পালন করার কথা বলেন। অবিভক্ত বঙ্গে তখন ছিল সুহরাওয়ার্দি-র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সরকার। পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখে ১৬ অগাস্ট কলকাতায় মুসলিম লীগের গুন্ডারা হিন্দুদের ওপর এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা নামিয়ে আনে। কয়েক হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়, হাজার হাজার হিন্দু নারী ধর্ষিতা হন এবং হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। ১৭ অগাস্ট হিন্দুরা মুসলিম হামলা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। ১৮ তারিখ বাঙালির নেতৃত্বে শিখ ও বিহারীরা কলকাতার মুসলিম মহল্লাগুলোতে এক বীভৎস প্রতিহিংসা নামিয়ে আনে এবং প্রথম দিনের ক্ষতি সুদে-আসলে পুষিয়ে নেয়। কলকাতা দাঙ্গার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় নোয়াখালিতে। বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা নিয়ে মেঘনার বাম তীরে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ আমলের নোয়াখালি জেলা। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের এই জেলাতে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৮%। ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন উৎসবমুখর হিন্দু বাড়িগুলিতে এক ভয়ংকর বিভীষিকা

নামিয়ে আনা হয়। গণহত্যা, লুঠ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ব্যাপকহারে নারী ধর্ষণ, মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ ছিল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা গোলাম সারওয়ার ছিলেন এই গণহত্যার মাস্টারমাইন্ড। প্রায় দশ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয় নোয়াখালিতে। এর থেকেও বেশি মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং গোমাংস খেতে বাধ্য করা হয়। গোটা জেলায় এমন কোনও বাড়ি ছিল না যার অন্তত একজন মহিলা ধর্ষিতা বা অপহৃতা হননি।

কলকাতার দাঙ্গা ও নোয়াখালির গণহত্যার অভিজ্ঞতা থেকে কলকাতার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও শুভবুদ্ধিযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারেন যে, হিন্দুরা শত চেষ্টা করলেও মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব— বিশেষত যেখানে মুসলিমরাই দুই বঙ্গ মিলিয়ে সংখ্যাগুরু। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব প্রথমে কলকাতাসহ সমগ্র বাংলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসি নেতৃত্বও এই বিষয়ে কিছু মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। কিন্তু পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিকরণের বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দু জনমত প্রবল থাকায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব অন্য চাল দেয়।

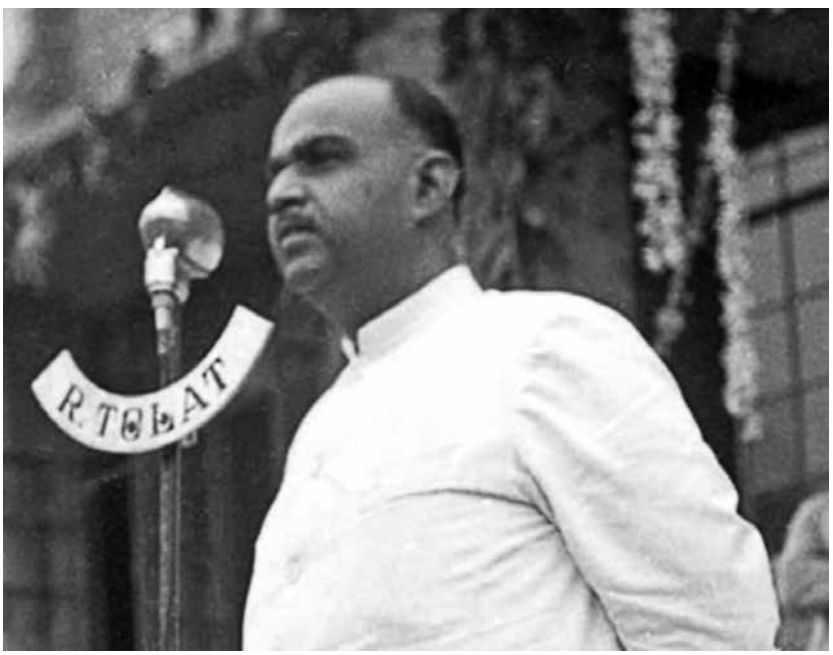

সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব বুঝে মুসলিম লীগ নেতা কট্টর ধর্মান্ধ সুহরাওয়ার্দি হঠাৎ বাঙালি-র ভেক ধারণ করলেন। তিনি বললেন— দুই বাংলা নিয়ে অখণ্ড বঙ্গ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হোক— যা কিনা ভারত-পাকিস্তান কোনও পক্ষেই যোগদান করবে না। কিন্তু অখণ্ড বাংলাতেও বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যালঘু হত। জিন্নাহও এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে হয়ত এই অখণ্ড বঙ্গ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে যোগদান করত। যাই হোক, সুহরাওয়ার্দির পাতা ফাঁদে পা দিলেন কংগ্রেসের দুই বর্ষীয়ান নেতা শরৎ চন্দ্র বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়। কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালি গণহত্যায় সুহরাওয়ার্দির ভূমিকার কথা তাঁরা ভুলে গেলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে, বাঙালি হিন্দু জাতটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাকে ভাগ করা, সেই সময় থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন বাঙালি হিন্দুদের বিষয়টি বুঝিয়ে জনমত তৈরি করার জন্য। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এবং তিনি প্রচণ্ড বেগে সারা বাংলা চষে বেড়াতে লাগলেন এবং বড় বড় জনসভায় ভাষণ দিয়ে মানুষকে বাংলা ভাগের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে লাগলেন। তিনি কংগ্রেসের কাছে আবেদন রাখলেন যে, তারাও যেন এই দাবিকে সমর্থন জানায়। ১৯৪৭-এর ১৫ই মার্চ কলকাতায় হিন্দু মহাসভা একটি দু'দিন ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য লর্ড সিনহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঘটক, ঈশ্বরদাস জালান, হেমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বহু মানুষও উপস্থিত হন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল যে বাংলা প্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করতে হবে। এই সভায় একটি কমিটিও গঠিত হল যাদের কাজ হবে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করা যা সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'-র ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় লেখা হয়— 'সম্প্রতি বাংলার কয়েকজন নেতা, পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী— কারণ বাংলার লীগ শাসনাধীনে, বাঙ্গালী হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবী জানাইতেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি, ডঃ প্রমথনাথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ ব্যক্তি এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।'

বাংলা ভাগ করা উচিত কিনা এই প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৯৪৭-এর ২৩-এ মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত একটি জনমত সমীক্ষা করে। ফলাফল ঘোষিত হয় ২৩ এপ্রিল। এতে মোট ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪৯টি উত্তর আসে। এর মধ্যে ১.১% উত্তর বাতিল হয়। বাকি উত্তরের মধ্যে ৯৮.৩% বাংলা ভাগের পক্ষে ও ০.৬% বিপক্ষে মত দেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ০.৪% ছিল মুসলমান। অর্থাৎ, এ সময়ে বাঙালি হিন্দুরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাগের পক্ষে ছিলেন তা বোঝা যায়।

১৯৪৭-এর ২৩ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটি বৈঠকে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন কেন বাংলা ভাগ করা দরকার। এই পরিকল্পনা বোঝানোর জন্য তিনি প্রচুর দলিল-দস্তাবেজ এবং মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং এইগুলি বড়লাটের আপ্তসহায়ক লর্ড ইসমে-র কাছে দিয়ে আসেন। ১৯৪৭-এর মে মাসে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস একত্রে জনসভা ডাকে যার সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও

১৯৪৭-এর ২৩ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটি বৈঠকে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন কেন বাংলা ভাগ করা দরকার। এই পরিকল্পনা বোঝানোর জন্য তিনি প্রচুর দলিল-দস্তাবেজ এবং মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং এইগুলি বড়লাটের আপ্তসহায়ক লর্ড ইসমে-র কাছে দিয়ে আসেন। ১৯৪৭-এর ২ মে শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই তথ্যনির্ভর পত্রে তিনি বাংলাভাগের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। এই চিঠিতে বাংলা ভাগের দাবি করে শ্যামাপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে,

'Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan.'

১৯৫২ সালে বনগাঁ সীমান্তে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ

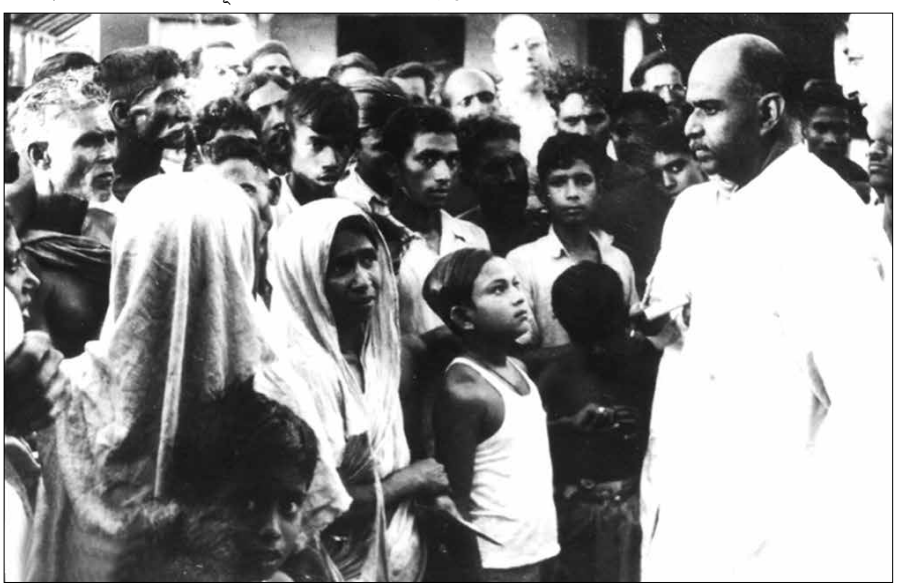

১৯৫২ সালে কাকদ্বীপে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যর যদুনাথ সরকার। ১৯৪৭-এর ২ মে শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই তথ্যনির্ভর পত্রে তিনি বাংলাভাগের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। এই চিঠিতে বাংলা ভাগের দাবি করে শ্যামাপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে, 'Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan.'

কলকাতার ব্রিটিশ মালিকানাধীন দৈনিক 'The Statesman' ১৯৪৭-এর ২৪-এ এপ্রিল 'Twilight of Bengal' শিরোনামে একটি সংবাদে লেখে, গত ১০ সপ্তাহের মধ্যে বাংলা ভাগ করার আন্দোলন একটি ছোট মেঘপুঞ্জের আকার থেকে একটি বিশাল ঝড়ের আকার নিয়েছে এবং এই ঝড় পুরো প্রদেশ জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যদিও এর কেন্দ্রভূমি হচ্ছে কলকাতা। এই ঝড় আরম্ভ করেছিল হিন্দু মহাসভা।

ইতিমধ্যে শরৎ বসু ও আবুল হাশিম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করেন। বর্ধমানের মানুষ এই আবুল হাশিম ছিলেন বাংলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি— যিনি কলকাতা দাঙ্গার আগে খুব স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু খুন করতে উস্কানি দিয়েছিলেন। এই খসড়া সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সবসময়েই হবেন একজন মুসলিম এবং সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে সমিতি থাকবে তাতে ৩০ জনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (১৬ জন) হবেন মুসলমান। অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখার একটি পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে রাখা হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এইসময় চেষ্টা করছিলেন সুহরাওয়ার্দি-বসু-হাশিম ত্রয়ীর এই ভয়ংকর পরিকল্পনাকে বানচাল করতে। ১৯৪৭ সালের মে মাসের প্রথম দিকে গান্ধী ও নেহেরুকে তিনি বাংলা ভাগের পক্ষে বললে তাঁরা খুব একটা নির্দিষ্ট করে কিছু জানান নি। ১৯৪৭-এর ১৩ মে শ্যামাপ্রসাদ সোদপুরে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সুহরাওয়ার্দির যুক্তবঙ্গের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান। গান্ধী বলেন, তিনি এখনও মনঃস্থির করে উঠতে পারেন নি। শ্যামাপ্রসাদ যখন গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষকে কল্পনা করতে পারেন কি না? স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে গান্ধী এর কোনও উত্তর দেন নি। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল খুব দৃঢ়ভাবে শ্যামাপ্রসাদকে চিঠিতে জানান যে, শ্যামাপ্রসাদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। বাংলার হিন্দুরা যতদিন নিজেদের স্বার্থ বুঝছে এবং সেই অবস্থান থেকে না সরছে ততদিন ভয়ের কোনও কারণ নেই। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার ডাক মুসলিম লীগের পাতা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বাংলাকে কখনই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতেই কংগ্রেসিরা দেখল তাদের ভোটার যারা, সেই হিন্দুরা (বাংলার মুসলিমরা প্রায় সকলেই মুসলিম লীগের সমর্থক ছিল) তাঁদের নপুংসকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু মহাসভার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। তখনই বাংলার কংগ্রেস দল নড়েচড়ে ওঠে। তারাও তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মতামতের তোয়াক্কা না করে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবানুসারেই বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা মন্ত্রীসভা গঠনের দাবি তোলে ১৯৪৭-এর ৪ঠা এপ্রিল। বাংলার আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙালি হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়।

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য পূরণের জন্য ৭৬টি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৫৯টির আয়োজন করে বাংলার কংগ্রেস কমিটি, ১২টির আয়োজন করেছিল হিন্দু মহাসভা এবং পাঁচটি যৌথভাবে আয়োজিত হয়। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৭ এর ২০-এ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের পশ্চিম অংশের সদস্যরা বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণ করে বাঙালি হিন্দুর হোমল্যান্ড বা পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাব ৫৮-২১ ভোটে পাশ করান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই কীর্তি (পশ্চিমবঙ্গ গঠনে) তাঁর জীবনীকার তথাগত রায়ের মতে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। নেহরু একবার শ্যামাপ্রসাদকে বলেছিলেন যে, 'আপনিও তো দেশভাগ সমর্থন করেছিলেন।' উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, 'আপনারা ভারত ভাগ করেছেন, আর আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি।' কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তী লিখেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব প্রতিরোধ করতে সমর্থ হলেন এবং দেশভাগের ভিতর আরেকটা দেশভাগ করিয়ে দিলেন।

অখণ্ড ভারত এবং জম্বুদ্বীপ ২০৫০ ও ২০৭০

অনিকেত মহাপাত্র

অখণ্ড ভারত। স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঋষি অরবিন্দের স্বপ্নের অখণ্ড ভারত। ভারতবর্ষের নতুন সংসদে একটি দেওয়াল চিত্রে স্থান পেয়েছে এই অখণ্ড ভারতের মানচিত্র, ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র। বলা যেতে পারে, সম্রাট অশোকের সময়ে 'ভারতবর্ষ'-এর মানচিত্র।

'অখণ্ড ভারত'— কথাটি আমরা আজ উদ্ধৃতির মধ্যে লিখছি; কিন্তু বোধহয় খুব বেশিদিন বাকি নেই— যখন আর দরকার পড়বে না উদ্ধৃতির মধ্যে রাখার। মহাকাল আদি এবং অনন্ত। 'অখণ্ড ভারত'-এর খণ্ডিত হতে হতে আজকের এই অবস্থায় আসা; এ তো আর দুই-এক দিনে হয়নি! দীর্ঘ এবং দীর্ঘ সময় লেগেছে। 'অখণ্ড' অবস্থায় আসার জন্য সময়ও লাগবে বেশ অনেকটা। আমরা ততদিন থাকতে পারি আবার নাও পারি। বেঁচে থাকব সন্ততির মধ্যে। তাদের চোখ দিয়ে দেখব হয়তো। কিন্তু এর জন্য আমাদের যে দায়িত্ব তা পালন করে যেতে হবে। 'আল্পস? দেয়ার ইজ নো আল্পস।' বাধা আছে, থাকবে কিন্তু আমরা বাধ্য নই।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংসদ-ভবনে 'অখণ্ড ভারত'এর একটি ম্যুরাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর অভিঘাত লক্ষ্য করুন। নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ কয়েকটি দেশের সরকারি ও বেসরকারি স্তরে সাড়া পড়ে গেছে। কী হল! সামাজিক মাধ্যম সহ অন্যত্র এমন একটি প্রতিবেশ তৈরি হয়েছে যে ওই দেশগুলি যেন এই জুনের (২০২৩) মধ্যেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল! এর দুইটি দিক আছে। প্রথমত— সাধারণ প্রতিবাদ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এইরকম বহু ইস্যুতে নিজেদের বিরোধী স্বরকে জানান দেবার রীতি আছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ভারত দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে— এই ম্যুরাল ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্রকে প্রত্যয়িত করেছে, সেই সঙ্গে সম্রাট অশোক (২৬৮-২৩২ প্রাক্-সাধারণাব্দ)-এর সময়কালীন সময়ে 'ভারতবর্ষ'-এর মানচিত্র।

দ্বিতীয়ত— এই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক সেই পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যখন সত্যিই 'অখণ্ড ভারত' সম্ভব। পরিস্থিতির যথার্থতা বিচার করেই তাদের এই 'আশঙ্কা' কিংবা 'অমূলক ভয়'।

সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা স্মরণ করুন। সমাজমাধ্যমের বা সামাজিক মাধ্যমের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে যদি তাকে পর্যবেক্ষণ করেন তবে বহু নির্ভেজাল তথ্য এবং তত্ত্ব উঠে আসে। যা এতদিন মুদ্রণ-মাধ্যম বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের 'এডিটিং'-এর কাঁচিতে 'পরিশীলিত', বলা ভালো বিকৃত হয়ে উঠত।

ওই সময়ে পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক এবং 'নাগরিক সমাজ' দেশভাগ তথা ভারতের থেকে আলাদা হবার যৌক্তিকতা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। যেন পাকিস্তান-টা ভারতের মধ্যে থাকলেই ভালো হত। চিন্তন ও অনুশীলনে যাদের এত বিষ তাদের এখানে আসা, বর্তমান ভারত দেশটির স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর সেইটি অন্য বিষয় অবশ্য। তবে সামাজিক স্তরে 'অখণ্ড ভারত'-এর একটি বৈধতার প্রত্যয়ন হয়ে যায়।

সামাজিক মাধ্যমে, মিম-এর নেতা আসাদ-উদ্-দিন ওয়েসি-র একটি ভাষ্য উঠে আসে। বিদেশে হওয়া একটি 'পাবলিক টক'-এ একজন পাকিস্তানি কিশোর ওয়েসি-কে প্রশ্ন করে ভারতীয় মুসলিমেরা কি পাকিস্তানিদের ভাই মনে করে! সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রসঙ্গে সংসদ ভবনে স্থাপিত 'অখণ্ড ভারত'-এর ম্যুরালের কথা ওঠে। ওয়েসি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন আফগানিস্তান

থেকেই শুরু হোক 'অখণ্ড ভারত' নির্মাণের কাজ। ব্যঙ্গের স্বর ছিল। কিন্তু ওয়েসি একথা বলছেন ভারতের নিরাপদ ও নিস্তরঙ্গ আশ্রয়ে তৈরি হওয়া 'মাইন্ডসেট' থেকে। আজ তিনি যদি আফগানিস্তানের কোনও রাজনৈতিক নেতা হতেন, এই সময়ের বাস্তবতায় তাঁর গলা থেকে ব্যঙ্গের বা কৌতুকের স্বর নির্গত হত না।

নেপালের প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতটি ভিন্নতর। দীর্ঘদিন চীনা ষড়যন্ত্রে 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো'র মতো স্থান পেয়েছে একটি 'বাম' মতবাদ। যা স্বভাবতই ভারত-বিরোধী। নেপালের জনমানসের মধ্যে 'অখণ্ড ভারত'-এর চেতনা সর্বাত্মক। নেপালি কংগ্রেসের এক-আধজন খুবই 'লো-প্রোফাইল' নেতা কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন; তা আসলে নেপালি কমিউনিস্ট পার্টিকে টেক্কা দিতে। এর মধ্যে সারবত্তা কিছু নেই।

বিগত বেশ কয়েক বছর ভারত অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি সহ বিবিধ বিষয়ে এমন সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে যে তার ছাপ স্পষ্ট তার বিদেশনীতিতে। ভারতের স্বাধীন বিদেশনীতির সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি এসেছে পাকিস্তান থেকে। প্রাক্তন পাক-প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভাষণগুলি লক্ষ্য করুন। কিংবা লক্ষ্য করুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী-র বিশেষ নামাঙ্কন; চীনা জনসমাজে তাঁর পরিচিতি 'মোদী লাওসিয়ান' বা 'অমর মোদী'। স্বভাবত উন্নাসিক চীনা সমাজ বিদেশের কোনও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে অতটা ভাবিত নয় কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন তাদের চর্চায়। 'লাওসিয়ান' তাঁদেরই তারা বলে যাঁরা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী।

চীনের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমেরিকা। সম্প্রতি বেশ কিছু ঘটনায় বিশ্ব-ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ছে। হয়তো আমেরিকার প্রভাব কিয়ৎ কমছে, কিন্তু এখনও তার শক্তি অটুট। এখনও তার মিলিটারি প্রথম সারির। অন্যদিকে রাশিয়া। ইউক্রেন পর্বে চীন-রাশিয়া মৈত্রী অন্যরকম মাত্রা নিলেও রাশিয়া চীনকে বিশ্বাস করে না। ভারত যদি রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তিতে কিছুটা ভূমিকা নেয় এবং রাশিয়া-আমেরিকা সম্পর্কে কিয়ৎ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় তবে চীন পড়ে যাবে চাপে। সেই হল মাহেন্দ্রক্ষণ যখন 'অখণ্ড ভারত' পুনরুদ্ধার সম্ভব। আমেরিকা স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে কিছু দড়ি-টানাটানি করবে, তার পেছনে উদ্দেশ্য ভারতীয় উপমহাদেশে আমেরিকা-সহায়ক একটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। তাকে পাত্তা না দিয়ে 'অখণ্ড ভারত'-এর প্রকল্পে এগিয়ে যেতে হবে। চীন সহজে বিধিবদ্ধ যুদ্ধে জড়াবে না। যুদ্ধ মানে খরচ প্রচুর। অর্থনৈতিক শক্তি দিয়েই তাকে টেক্কা দিতে হবে আমেরিকাকে। তাছাড়া চীনের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ যুদ্ধের সময়ে বদলে যেতে পারে। শি জিনপিং-এর পতনও অসম্ভব কিছু নয়। শি সেই ভয় পান তাই পার্টির সংবিধান বদল করে আজীবন ক্ষমতায় থেকে যাবার জন্য এত প্রচেষ্টা। আর ভারত যে পদক্ষেপ নিক তা দীর্ঘমেয়াদি করা যাবে না। ঝটিকা-আক্রমণের মাধ্যমে খুব কম সময়ে পুরো ব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তবে তার আগে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত-ধর্মকে একটি 'মিশনারি ফর্ম' দিতে হবে। তবেই ক্ষেত্র হবে প্রস্তুত। আর 'অখণ্ড ভারত'-এর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলির সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করে ফেলবার ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজনীয়। তেমনই প্রয়োজনীয় পারমাণবিক ভাণ্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। সব মিলিয়ে এই কথা অমূলক নয় যে ২০৫০ সাধারণাব্দ হয়ে উঠতে পারে 'অখণ্ড ভারত' পুনরুদ্ধারের সময়সীমা। এর পরবর্তী লক্ষ্য হবে 'জম্বুদ্বীপ' পুনরুদ্ধার। সেই ক্ষেত্রেও কাজ করবে সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতবর্ষের প্রভাব-বৃত্ত বা অস্তিত্ব। সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে থাকা ভারতভূমির একত্রীকরণ— 'জম্বুদ্বীপ'। লক্ষ্য : ২০৭০ সাধারণাব্দ।

(মতামত ব্যক্তিগত)

ফেক নিউজ

ফেক নিউজ

করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার পর কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করে তারা সেখানে উপস্থিত ছিল বলে। তাদের দাবি লাশ পাচার সহ কারচুপির জন্য সেখানে জ্যামার বসানো হয় এবং তার ফলে মোবাইল নেটওয়ার্ক চলে গিয়েছিল। উপমা নামের এক ভদ্রমহিলা গণমাধ্যমে এই পোস্ট দিতেই ভাইরাল হয় সেই পোস্ট। বিভিন্ন ট্রাভেল গ্রুপে এই তথ্য তিনি নিজে হাতে লিখে পোস্ট করেছিলেন।

আসল খবর

জ্যামার বসিয়ে লাশ পাচারের তত্ত্ব আসলে সম্পূর্ণ একটি মনগড়া গল্প। ঘটনাস্থলে কোনো জ্যামার ছিল না বলে সেই ভুল শুধরে দেন কেউ কেউ। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, দিনরাত দাঁড়িয়ে থেকে গোটা পরিস্থিতির দেখভাল করলেও ততক্ষণে কিন্তু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা বপনের যে কাজ ফেক নিউজ ছড়ানো মানুষগুলোর ছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রতিটি মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ টেস্ট সহ সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে রেল ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং তদন্তে যারা দোষী প্রমাণিত হবে তাঁদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ফেক নিউজ

স্কুলের টেক্সট বুক থেকে নাকি ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' এবং মেন্ডেলিভের 'পর্যায় সারণী' বাদ দেওয়া হয়েছে! ফেসবুক, ট্যুইটার হয়ে প্রিন্ট মিডিয়া অব্দি ছড়িয়ে দেওয়া হল মিথ্যে খবর।

আসল খবর

কিন্তু স্কুলেরই অন্য ক্লাসের পাঠ্য বইয়ে 'বিবর্তনবাদ' ও 'পর্যায় সারণী' উভয়ই

রয়েছে। সত্যি ঘটনা ট্যুইট করে জানিয়েছে এনসিইআরটি।

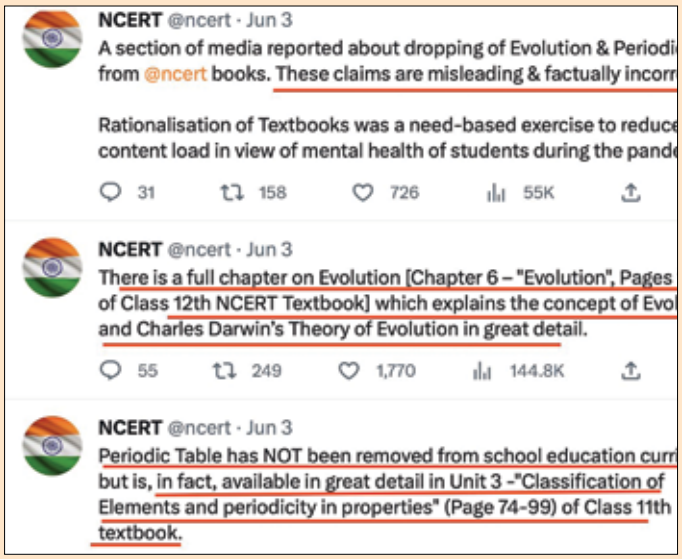

ফেক নিউজ

করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর, ভারতের প্রথম সারির ইংরাজি সংবাদপত্র 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' দাবি করে ভারতের ৯৮ শতাংশ রেলপথ নাকি তৈরি হয়েছে ১৮৭০ এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে। আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ নামে এক সংস্থার ২০১৮ সালের এক স্টাডিতে নাকি এমন কথাই বলা হয়েছিল।

আসল খবর

'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র এই খবরকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংবাদিকতা' বলে ট্যুইট করে ভারতীয় রেল। বাস্তব তথ্য হল ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের রেলপথের (রানিং ট্র্যাক) মোট দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাজার কিলোমিটারেরও কম, ভারতীয় রেলসূত্র অনুযায়ী ৫৯,৩১৫ কিমি। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে যা ছাড়িয়ে গেছে এক লক্ষ কিলোমিটার (রানিং ট্র্যাক), ভারতীয় রেলসূত্র অনুযায়ী ১,০৭,৮৩২ কিমি। অর্থাৎ বর্তমান রেল লাইনের অনেকটাই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নির্মাণ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার পর যতটা রেলপথ তৈরি হয়েছে তার অধিকাংশই বিজেপি সরকারের আমলে।

ফেক নিউজ

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মণিপুরের আদিবাসী ভাইবোনেরা নাকি আলাদা প্রশাসনের দাবি জানাচ্ছে।

আসল খবর

বাস্তবে এটা ভুল তথ্য। আগের ছবিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এডিট করে ছড়ানো হচ্ছে এই ফেক নিউজ।

ফেক নিউজ

টুইটারে ফেক নিউজ ফ্যাক্টরি দাবি করে, 'টেলিগ্রাম' সমাজমাধ্যমে, কো-উইন পোর্টাল থেকে টিকাগ্রহীতাদের তথ্য ফাঁস হয়েছে। এক কদম এগিয়ে, তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন লালবাজারে সাইবার সেলে লিখিত অভিযোগও জানান।

আসল খবর

২০২১ জুন মাসের ১১-১২ তারিখ নাগাদ ঠিক একই কায়দায় এবং একই শব্দ ব্যবহার করে, কো-উইন পোর্টাল থেকে টিকাগ্রহীতাদের তথ্য ফাঁস হয়েছে বলে ভুয়ো খবর ছড়িয়েছিল, ডেটা লিক মার্কেট নামে একটি ফেক ওয়েবসাইট। ২০২৩-এ ও প্রায় একই কায়দায়, একই সময়ে আবার সেই টিকাগ্রহীতাদের তথ্য ফাঁসের দাবি। 'টেলিগ্রাম' সমাজমাধ্যমের 'তথ্য ফাঁসের দাবি'কে একেবারে নস্যাৎ করে ১২ জুন ২০২৩-এ কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি দফতর জানিয়েছে, ওটিপি ছাড়া টিকাগ্রহীতাদের কোনও তথ্যই কাউকে শেয়ার করা হয় না। আপনার তথ্য দেশের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের হাতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এই ধরনের মিথ্যে খবর ছড়ানো হয় জনসাধারণকে ভয় দেখিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলতে।

ফেক নিউজ

এই ছবি দেখিয়ে বলা হল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হাতে থাকা আধা সামরিক বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করেছে আন্দোলনরত কৃষকদের উপরে। ট্যুইট করে এ ভুল তথ্য ছড়িয়েছিল আম আদমি পার্টির নেতা থেকে আরম্ভ করে আন্দোলনরত কুস্তিগীর পর্যন্ত।

আসল খবর

বাস্তব সত্য হল এ ছবি ২০১৯ সালের। এক অটো ড্রাইভারের, কোনো কৃষকের নয়।

9 Years

Seva, Sushasan and Garib Kalyan

Vande Bharat Express

India's First Semi-High Speed Train

মধ্যপ্রদেশের শাহদোলের পাকরিয়ায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আদিবাসী নেতা, স্থানীয় ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর খোলামেলা আলোচনায় উঠে এসেছে নরেন্দ্র মোদীর সময়কালে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তাঁরা তাঁদের জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছেন

দিল্লি মেট্রোতে মোদী ম্যাজিক।
রিলস, ওটিটি নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে খোশগল্পে মাতলেন মোদী। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মেট্রোতে ওঠেন মোদী।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে প্রণয় রায় কর্তৃক ৬ মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা - ৭০০০৭৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।